পরমহংস

স্বামী নিগমানন্দ

ভবেশ দত্ত

৬৮, কলেজ স্ট্রীট
কলিকাতা-৭০০০৭৩

PARAMHANSA SWAMI NIGAMANANDA

BY

BHABESH DUTTA

প্রকাশক :
শ্রীপ্রবীরকুমার মজুমদার
নিউ বেঙ্গল প্রেস (প্রাঃ) লিঃ
৬৮, কলেজ স্ট্রীট,
কলিকাতা-৭০০০৭৩

মুদ্রক :
এস. সি. মজুমদার
নিউ বেঙ্গল প্রেস (প্রাঃ) লিঃ
৬৮, কলেজ স্ট্রীট,
কলিকাতা-৭০০০৭৩

প্রচ্ছদপট এঁকেছেন
দীলিপ দাস

প্রথম সংস্করণ
১৩৬৬

প্রাণাধিক

অরুণকুমার মিত্র

ও

ভারতী মিত্র-কে

—বাবা

স্বামী নিগমানন্দের পূতঃ জীবনী লেখা খুবই দুঃসাধ্য। এই সব মহাপুরুষের জীবন-কথা আলোচনা করতে গেলে যতটা গভীর জ্ঞান ও একনিষ্ঠ ভক্তির প্রয়োজন, ততটা জ্ঞান ভক্তি আমার নেই। তবুও কলম ধরেছি স্বামী নিগমানন্দের আশীর্বাদ মাথায় নিয়ে যতটুকু তাঁর সম্বন্ধে বলতে পেরেছি, তাও তাঁরই কৃপাবলে। জানি না এ বই পড়তে গিয়ে কার কেমন লাগবে। তাই সবার কাছে আমার অনুরোধ, যদি এর ভিতর কোন ভুল ত্রুটি থাকে, সব কিছু যেন তাঁরা নিজগুণে ক্ষমা করে নেন।

এই বই লিখতে গিয়ে শ্রদ্ধেয় শ্রীশিশিরকুমার বসুর "নিগমানন্দ স্মৃতি" পুস্তকের সাহায্য নিয়েছি। নদীয়া জেলার সীমান্ত গ্রাম শিকারপুর নিবাসী শ্রদ্ধেয় শ্রীসুধাংশুশেখর বাগচী, যিনি এককালে স্বামী নিগমানন্দ প্রতিষ্ঠিত কুতুবপুর উচ্চ বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করতেন, তাঁর কাছ থেকে কিছু কিছু তথ্য সংগ্রহ করেছি। তাঁকে আমার কৃতজ্ঞতা জানাই। হালিশহর নিগমানন্দ আশ্রমের স্বামীজীদের সৌজন্যে বইয়ের সব ছবিগুলি পেয়েছি; সে জন্য তাঁদের কাছে আমি ঋণী। স্বামী নিগমানন্দের জেঠতুতো ভগিনী পরম পূজ্যা বিজলীপ্রভা দেবী এ বইয়ের ভূমিকা লিখে দিয়ে বইটির সৌষ্ঠব বৃদ্ধি করেছেন; আজ তিনি লোকান্তরিতা—তাঁর উদ্দেশ্যে জানাই সশ্রদ্ধ প্রণাম।

ভবেশ দত্ত

আজ সুদীর্ঘ ৩৫-৩৬ বছর হয়ে গেল, আমরা আমাদের প্রাণের ঠাকুরকে হারিয়েছি ; তিনি আজ বিদেহী, কিন্তু তাঁর প্রত্যক্ষ অনুভূতি আজও তাঁর শিষ্য ভক্ত সকলের ওপর প্রভাব বিস্তার করছে। ঠাকুর তাঁর জীবদ্দশায় কঠোর সাধনাদ্বারা সনাতন ধর্মের জ্ঞানসমুদ্র মন্থন করে যে অমৃত আহরণ করেছিলেন তা অকাতরে নিদ্রিত জনসাধারণের মধ্যে বিতরণ করেছিলেন। শত শত মুমুক্ষু ব্যক্তি তাঁর পুণ্য সংস্পর্শে ধন্য ও কৃতার্থ হয়েছে। সহস্র সহস্র গৃহী তাঁর কৃপালাভে আত্মোন্নতির পথ-নির্দেশ পেয়েছে। বর্তমান অশান্ত বিরোধের যুগে সেই পরম শক্তিসম্পন্ন মহাপুরুষ প্রদর্শিত পথই বিরোধ সমাধানের একমাত্র সহায়ক। আধিকারিক পুরুষ পরমহংস স্বামী নিগমানন্দের জীবনী ও বাণীর প্রচার বর্তমান যুগে বিশেষ প্রয়োজন।

মহাপুরুষ শ্রীশ্রীঠাকুর নিগমানন্দের কয়েকটি জীবনীপুস্তক ইতিপূর্বে প্রকাশিত হয়েছে। তন্মধ্যে শিশিরকুমার বসু প্রণীত "শ্রীশ্রীনিগমানন্দ স্মৃতি" ঠাকুরের জীবনের বহু উপাদান সম্বলিত গ্রন্থ। ঠাকুরের অন্তরঙ্গ স্বামী সত্যানন্দ সরস্বতী ও স্বামী সিদ্ধানন্দ সরস্বতী সম্পাদিত "জীবনী ও বাণী" ঠাকুরের সাধন-জীবন ও তাঁর জীবনদর্শনের আলোকপাত করেছে। শ্রীশ্রীঠাকুরের কৃপাপ্রাপ্ত স্বামী প্রজ্ঞানন্দ সরস্বতী রচিত "শ্রুতিস্মৃতি" ঠাকুরের শ্রীমুখ নিঃসৃত উপদেশামৃতের অপূর্ব সংগ্রহ সমাবেশ। ঠাকুরের স্নেহধন্যা মানসকন্যা শ্রীমতী নারায়ণী দেবী প্রণীত "বাংলার সাধনার নিগমানন্দ" গ্রন্থখানি উনিশ শতকের মধ্যভাগ থেকে বিংশ শতাব্দীর শেষার্ধ পর্যন্ত বাংলাদেশের সমাজচিত্রের পরিস্ফুট চিত্র সহ শ্রীশ্রীঠাকুর নিগমানন্দের জীবন রহস্য ও জীবন দর্শনের একটি সুন্দর গ্রন্থ হয়েছে। ঠাকুরের ভক্তপ্রবর শ্রীতারক হালদার মহাশয়ের "তোমাদের নিগমানন্দ" ও "মহাসাধক নিগমানন্দ" পুস্তক দুখানিও শ্রীশ্রীঠাকুরের মহিমা প্রচার করছে।

সম্প্রতি শ্রীভবেশ দত্ত সংকলিত "পরমহংস স্বামী নিগমানন্দ" নামক একটি পুস্তকের পাণ্ডুলিপি পাঠের সুযোগ পেলাম। ভবেশবাবু প্রণীত ঠাকুরের প্রথম গুরু বামাক্ষেপার জীবনীও পাঠের সৌভাগ্য হল। ঠাকুরের কৃপায় শ্রীভবেশ দত্ত মহাশয় শ্রীশ্রীঠাকুরের জীবনের ঘটনাবলী ও তাঁর সাধন-জীবনের উপলব্ধি সহজ সরল সাবলীল ভাষায় সাধারণের সুপাঠ্য করে পরিবেশন করেছেন। পুস্তকখানি প্রকাশিত হলে ঠাকুরের মহিমা কীর্তন, যাঁরা ঠাকুরকে দেখেন নি,

তাঁদের মধ্যে প্রচারিত হবে। আশাকরি এই সমস্যাসংকুল যুগে এইরূপ পুস্তকের অধিক প্রচার অত্যাবশ্যক। শ্রীশ্রীঠাকুরের নাম কীর্তন যতই প্রচারিত হবে ততই সমাজের অন্ধকার দূর হবে; বিরোধ যুগের সমাপ্তি হবে। শ্রীভবেশ দত্ত মহাশয় প্রকাশিত পরমহংস স্বামী নিগমানন্দের জীবনী বাংলার ঘরে ঘরে প্রসারলাভ করুক। বাঙালীর অশান্তপ্রাণে শান্তি আসুক।

যাঁর নাম সংকীর্তন সর্ব পাপ বিনাশ করে, যাঁকে প্রণাম করলে সর্ব দুঃখের অবসান হয়, সেই পরমপুরুষ শ্রীশ্রীঠাকুর-শ্রীচরণে প্রণতি জানাই॥

মাহেশ, শ্রীরামপুর,

শ্রীশ্রীঠাকুরশ্রীচরণাশ্রিতা
বিজলীপ্রভা দেবী।
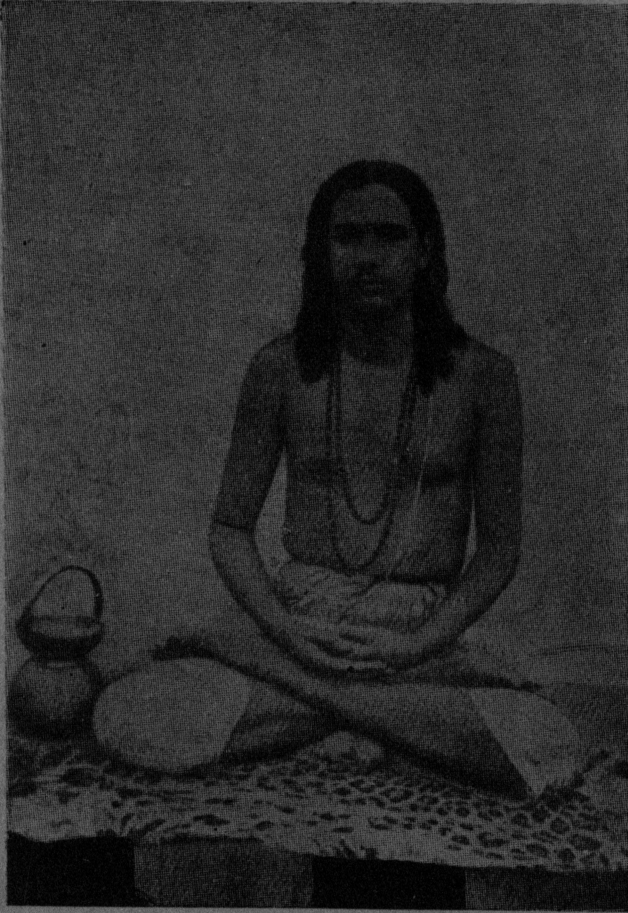
শ্রীমৎ স্বামী নিগমানন্দ সরস্বতী পরমহংসদেব
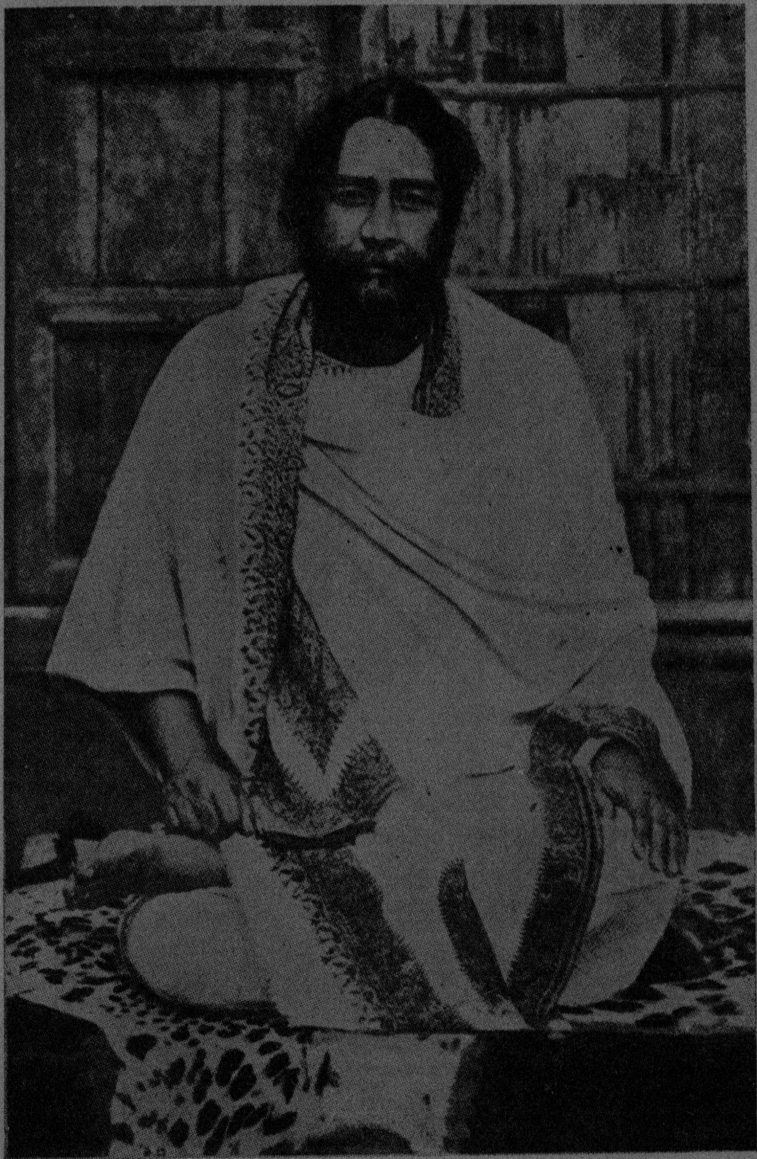
সাজে নয় শুধু কাজে পরমহংস, ঠাকুর নিগমানন্দ
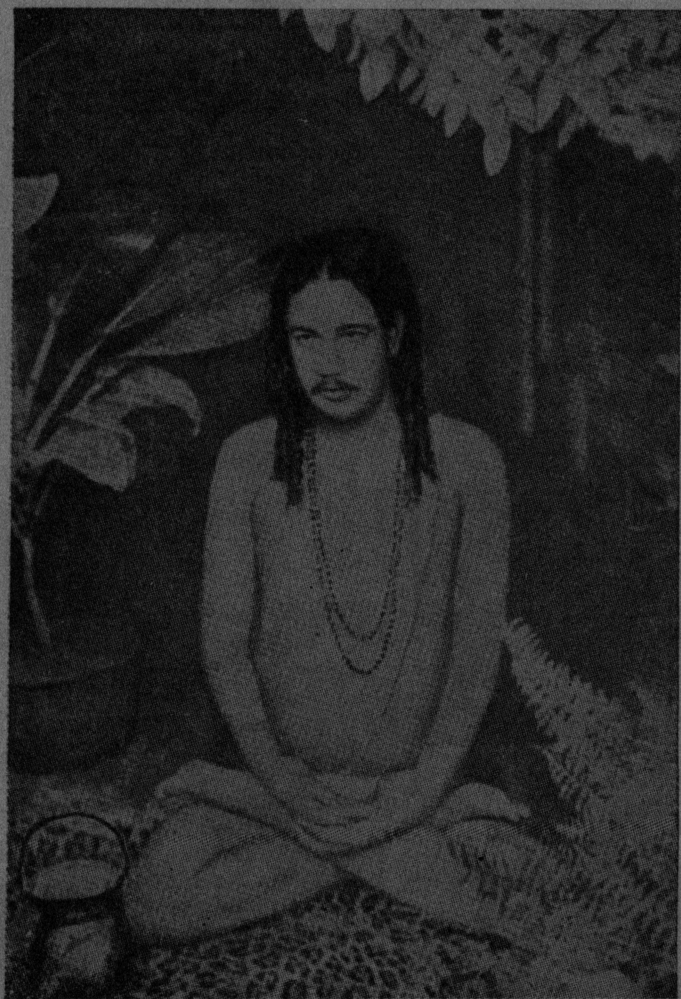
শ্রীমৎ ১০৮ স্বামী নিগমানন্দ পরমহংসদেব
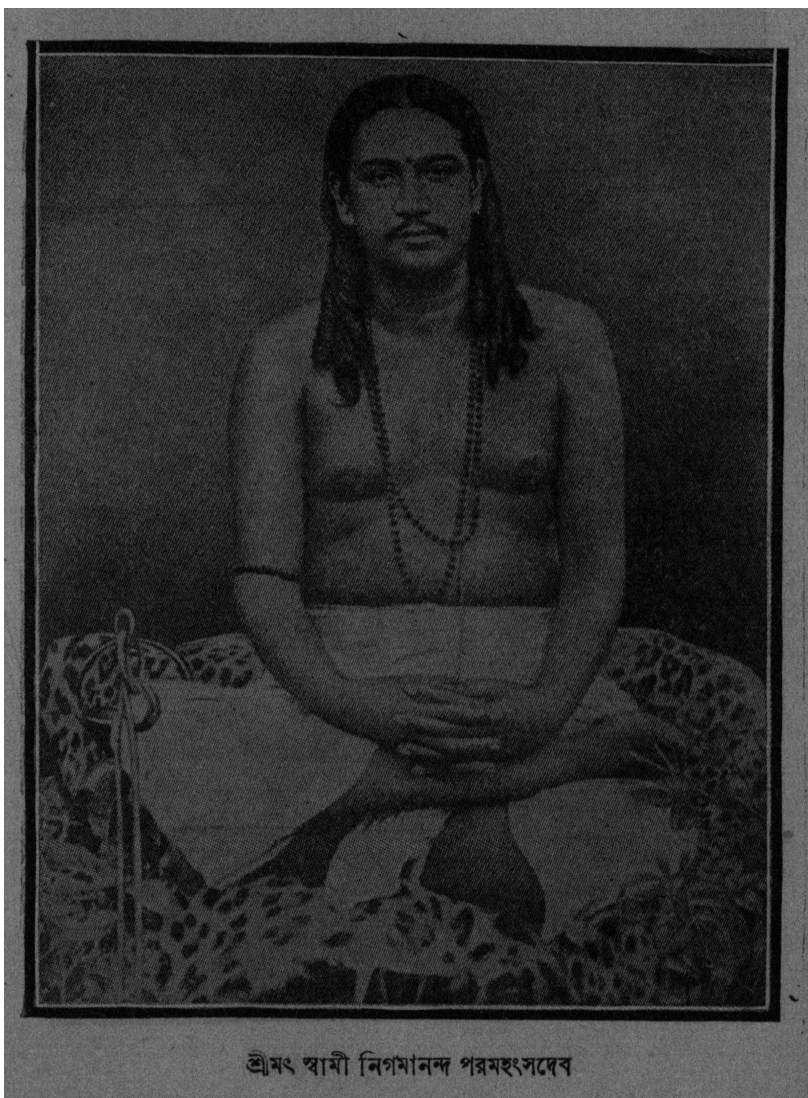
শ্রীমৎ স্বামী নিগমানন্দ পরমহংসদেব
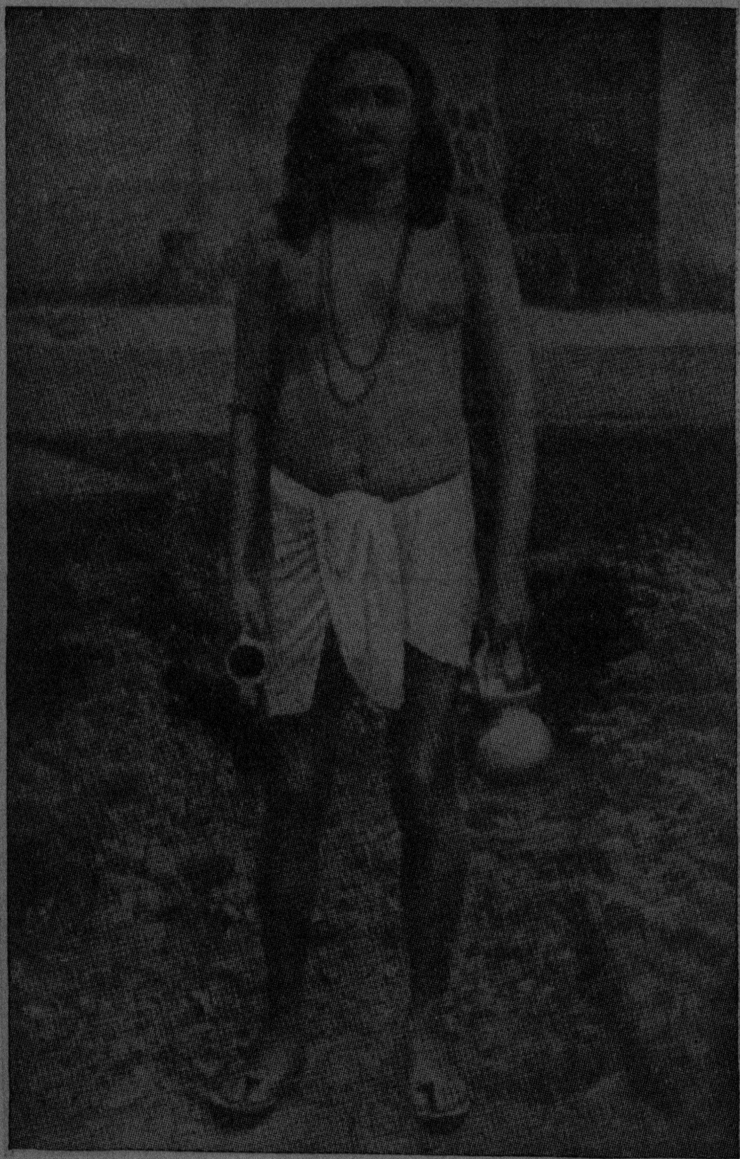
শ্রী ১০৮ স্বামী নিগমানন্দ পরমহংসদেব
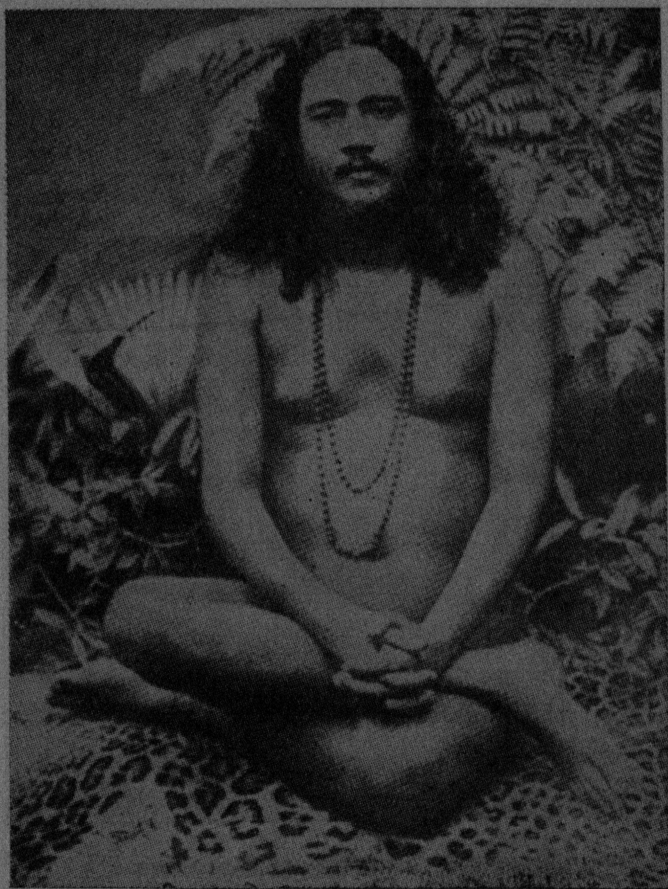
শ্রী ১০৮ স্বামী নিগমানন্দ পরমহংসদেব

জয়গুরু
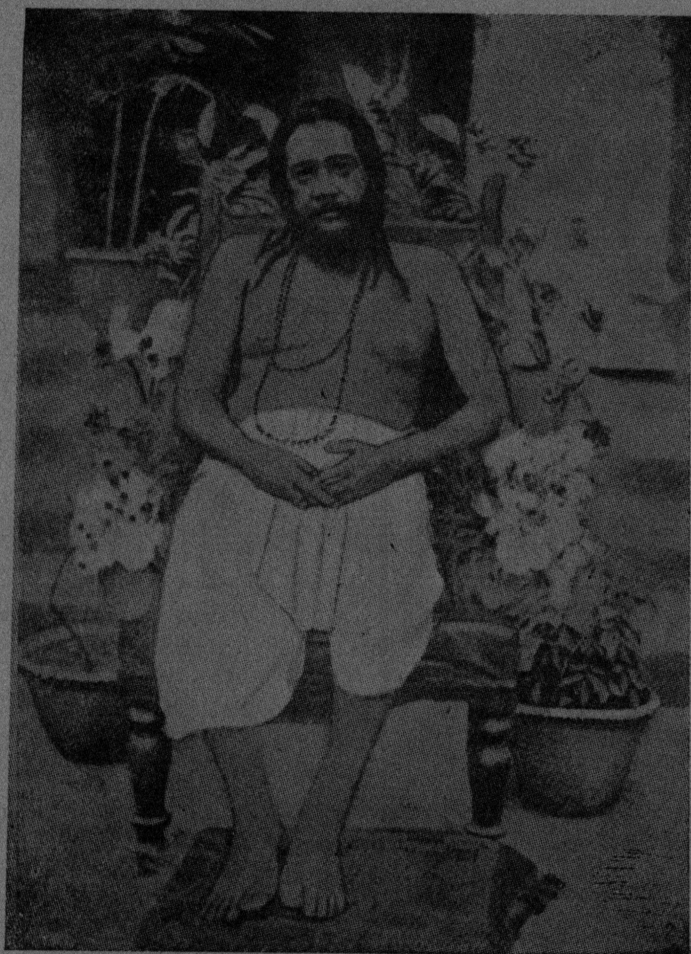
শ্রী১০৮ স্বামী নিগমানন্দ সরস্বতী পরমহংসদেব

আবর্ভিাব—নদীয়া তিরোভাব—হালিসহর

॥ ১ ॥

পতিত জমি জরীপ করে কেউ কেউ—

চাষ করে, বীজ ছড়ায়।

কারও ফসল ফলে, কারও ফলে না।

কিন্তু জীবনের পতিত জমি জরীপ করে ক'জন? অনেক পথ চলে এসে পিছনে ফিরে তাকালে কি ফেলে আসা জিনিস কিছু চোখে পড়ে? পড়ে না।

কত আপন জন, কত আত্মীয় অনাত্মীয়, কত ভালোবাসার মানুষ যারা ক্ষণেকের অদর্শনে মূর্ছিত হতো, ধীরে ধীরে পর্দার ছবির মত সব মিলিয়ে যায়।

সবই তো চলে গেলো! তবে থাকলোটা কি!

যাকে রাখলে সে থাকতো, যাকে ডাকলে সে ডাক শুনতো, যার জন্য কাঁদলে সেও কাঁদতো, যার জন্য ভাবলে সেও ভাবতো, যাকে ভালোবাসলে সেও ভালোবাসতো, যিনি এই অনিত্য সংসারে একমাত্র নিত্যবস্তু—সেই পরম বস্তুকে পাবার জন্য জীবনের পতিত জমি জরীপ করতে হবে। যন্ত্র! হ্যাঁ যন্ত্রও আছে বৈকি! শ্রদ্ধা আর ভক্তির মালমশলা দিয়ে তৈরী সে যন্ত্র। জরীপ যার নিভুর্ল হবে, পতিতের ভগবান সেই পতিত জমিতে ফসল হয়ে দেখা দেবেন।

সে ফসল কি!

সে ফসল মুক্তি, সে ফসল পরম করুণাময়ের কাছে পাকাপাকি আশ্রয়। এ আশ্রয় যারা চায় তারা অবশ্যই পায়। আশ্রয়হীনের যিনি পরম আশ্রয় তিনি কাউকে পথে বসান না। কোনদিন কাউকে পথে বসান নি, বসাবেনও না। তিনি যে দয়াল।

এমনি আশ্রয় পাবার জন্য দুজন মানুষ মজে যাওয়া এক নদীর ধারে বসে জীবনের পতিত জমি জরীপ করছিলেন। একজনের দু'চোখে জলের ধারা আর একজনের চোখ দুটো সেই জলের ফোঁটা গুনে চলেছে।

এক, দুই, তিন।

চার, পাঁচ, ছয়।

একজন চোখ মুছে বললেন : আর কতকাল !

অন্যজন জবাব দিলেন : তোমার, আমার, সকলের যিনি কালের হিসাব রাখেন, তাঁকেই বলো।

আবার জলের ধারা, ফোঁটা ফোঁটা অশ্রু।

এক, দুই, তিন।

চার, পাচ, ছয়।

তাঁরা দুই জন।

স্বামী আর স্ত্রী।

একজন ভুবনমোহন চট্টোপাধ্যায় আর একজন মানিকসুন্দরী দেবী। পরিবারটা ভট্টাচার্য পরিবার নামেই খ্যাত ছিল। সং-সেজে যাঁরা এই অনিত্য সংসারে সার বস্তুর সন্ধান করে বেড়ান, তাঁরাও সেই দলের।

ভুবনমোহন ন্যায়পরায়ণ, ধামিক ও সত্যনিষ্ঠ ছিলেন।

মানিকসুন্দরীও খুব দয়াবতী ছিলেন। দীন-দরিদ্র তাঁর কাছে এসে কেউ শূন্য হাতে ফিরে যেতো না। অপরের সুখ-দুঃখ যেন তাঁর নিজেরই বলে মনে হতো। সুখে-শান্তিতেই তাঁর জীবনের দিনগুলো ডানা মেলে উড়ে যেতো। বড় সুখী তিনি, দেবতার মত স্বামী, স্নেহ-ভালোবাসার এক একটা মূর্ত প্রতীক তাঁর আত্মীয়-স্বজন ও গ্রামের মানুষ।

কিন্তু তবুও তাঁর মনে হতো যেন কি এক অজানা ব্যথা তাঁর সমস্ত হৃদয় জুড়ে কেঁদে কেঁদে বেড়াচ্ছে। এত সুখের ভিতরেও তাঁর মন-প্রাণ যেন শূন্য মনে হতো, কি যেন নেই, কি যেন পেলে তাঁর সমস্ত হৃদয় ভরে উঠতো। মাঝে মাঝে তাঁর বিষাদভরা মুখখানার দিকে চেয়ে কেউ কেউ বলতো : ভগবানের কি বিচার ! এমন সোনার প্রতিমা, এর কোলে একটা ছেলে দিতে পারে না।

মানিকসুন্দরী মনের দুঃখ মনে রেখেই জবাব দিতেন : কেন গো, আমার ছেলের আবার অভাব কোথায় ? নিজে পেটে না ধরলেও আমার কানে মা-ডাক সব সময় আছে। ওরাই তো আমার ছেলে। ওরা যখন 'মা' 'মা' বলে ডাকতে ডাকতে আমার কাছে আসে, তখন আমার সারা বুক ভরে যায়। পেটে না ধরলেও মা হওয়া যায়।

সবার অলক্ষ্যে নিজের ঘরে চলে যেতেন। হয়তো তাঁর চোখ দুটো জলে

ভরে আসতো, হয়তো তাঁর বুকটা ভেঙে গুঁড়ো গুঁড়ো হয়ে যেতো। কে জানে—

স্বামী ভুবনমোহনেরও মনে যে দুঃখ ছিল না তা নয়। প্রথমে পর পর দুটো মেয়ে হয়। একটা ছেলে না হলে তাঁর পুন্নাম নরক থেকে উদ্ধার পাওয়ার কোন পথ নেই। তা ছাড়া ছেলে না হলে পিতৃ-পুরুষের মুখে জল দেবে কে?

মূর্তিমতী করুণার আধার মানিকসুন্দরী স্বামীর বিষণ্ণ মুখের দিকে চেয়ে কখনও অন্যমনা হয়ে যেতেন। কিন্তু কিছু বলতেন না। মনের দুঃখ মনে চেপে রেখেই তিনি সংসারের সবার সঙ্গে হেসে-খেলেই দিন কাটাতেন। কাউকে বুঝতে দিতেন না, কি তাঁর ব্যথা।

তখনকার দিন আর এখনকার দিন আকাশ পাতাল ব্যবধান। সে সময় গ্রাম-পাড়াগাঁর মানুষের এখনকার মত এত বেশী অভাব অভিযোগ ছিল না।

কুতুবপুরের মানুষেরও খুব দুঃখ-কষ্ট ছিল না। যে যে কাজ করে সংসার প্রতিপালন করতো তাতেই তার সুখে-শান্তিতে দিন চলে যেতো।

নদীয়া জেলার মেহেরপুর মহকুমার ভিতর কুতুবপুর গ্রাম। চুয়াডাঙ্গা রেল-স্টেশন থেকে আটাশ মাইল। গ্রামের অধিকাংশই শাঁখার ব্যবসা করতো। তাদের বাইরে যাবার প্রয়োজন হতো না। সুখে শান্তিতে যখন সংসার চলে যাচ্ছে তখন আর অন্যত্র যাবার প্রয়োজন কি? তখনকার দিনে গ্রামে মনসা পূজা, শীতলা পূজা, পালা-কীর্তন, মনসার ভাসান প্রভৃতির প্রচলন ছিল বেশী। ছয়-সাতখানা গ্রাম নিয়ে একখানা দুর্গাপূজা হতো।

এই সব লোক। এরা এ সবের মাঝেই দেব-দেবতার সন্ধান করতো। ঈশ্বর কি? তাঁর সাধনা কি? এ সব নিয়ে মাথা ঘামায় নি কোনো দিন—আধ্যাত্মিক জগৎ সম্বন্ধে এরা সম্পূর্ণ উদাসীন ছিল। কিন্তু অধ্যাত্ম জগৎ সম্বন্ধে এদের জ্ঞান না থাকলেও এরা যা করতো তার মাঝেই বুঝি দেবতার দর্শন পেতো, কীর্তনের মাঝে এরা যেন দেবতার পদধ্বনি শুনতে পেতো। এও যে একরকমের সাধনা। মন্ত্র-তন্ত্র না জানলে কি সাধন ভজন হয় না—পুঁথি-পত্র বেদ-বেদান্ত না পড়লে কি জ্ঞানী হওয়া যায় না!

তাই একদিন এদেরই মাঝে কুতুবপুরের মাটিতে জন্ম নিলেন ভারতবর্ষের একজন মহান সাধক। কে জানতো, কে কল্পনা করতে পেরেছিল যে এক

মহাজ্ঞান তপস্বী সাধক এই কুতুবপুরের মাটিতে জন্মগ্রহণ করবেন! কে আগে ভেবেছিল যে অধ্যাত্ম জগৎ সম্বন্ধে উদাসীন বাংলার এক অখ্যাত অজ্ঞাত পল্লীর মাটিতে অধ্যাত্ম জগতের এক মহান গুরুর আবির্ভাব ঘটবে!

দেব-দ্বিজে ভক্তিমান ভুবনমোহন কুতুবপুরের মানুষকে আপন করে নিয়েছিলেন—দ্বিজশ্রেষ্ঠ হয়েও কাউকেই হেয়জ্ঞান করেন নি।

কুতুবপুরের মানুষও ভুবনমোহনকে সব সময় আগলে রাখতো। এই মানুষটার গায়ে যাতে কাঁটার আঁচড় না লাগে সেদিকে নজর ছিল সবার।

কুতুবপুরের আট মাইল দক্ষিণে রাধাকান্তপুর গ্রাম। এই গ্রামেরই সচ্ছল অবস্থাবান ব্রাহ্মণ ত্রৈলক্যনাথ চক্রবর্তী মানিকসুন্দরী দেবীর পিতা। তিনিও অপুত্রক, তাঁরও সেই একই চিন্তা। কন্যার একটা পুত্রসন্তান না হলে তাঁরও যেন কোন শান্তি নেই।

কুতুবপুর আর রাধাকান্তপুর যেন একই চিন্তার সাগরে ভাসছে। নারীকুলে জন্মে যদি মা না হতে পারলো তাহলে সে জীবনের সার্থকতা কি?

মানিকসুন্দরী দেবী নিত্যপূজা মন-প্রাণ দিয়ে শুরু করলেন। ব্রত উদ্‌যাপন যতদূর সম্ভব তাও বাদ দিলেন না। এক শুভদিন দেখে তিনি গ্রামের দীন-দরিদ্রকে সেবা দিলেন। কার্তিক মাসে কার্তিক পূজাও মন-প্রাণ উজাড় করে করলেন।

ভুবনমোহন একদিন রাতে বললেন: এত করছ, তাও যদি ভগবান তোমার মনোবাসনা পূর্ণ না করেন তাহলে কি বুঝবো বলতে পারো।

মানিকসুন্দরী হাসেন: তুমি আশীর্বাদ করো তাহলে আমার সব আশা পূর্ণ হবে। আমি বেশ ভাল ভাবেই জানি, আমার কোল জুড়ে এক সুদর্শন ছেলে আসবে। এত পূজার্চনা আমার বৃথা যাবে না।

: তাই হোক! জীবনে জ্ঞানতঃ কোন অন্যায় করি নি, তবু যদি ভগবান আমায় পুত্র থেকে বঞ্চিত করেন তাহলে বুঝবো সে আমার ভাগ্য।

ভুবনমোহন আর কোন কথা বলেন না। মানিকসুন্দরীর চোখ দুটো জলে ভরে আসে। চিবুক বেয়ে জলের ধারা বয়ে আসে। এ অশ্রুধারার কোথায় উৎপত্তি তা ভুবনমোহন জানেন।

: তুমি কাঁদছো কেন?

: ভগবান কাঁদালে কাঁদতেই হবে। এ জীবনে যদি কাঁদতেই এসে থাকি তুমি কি আমাকে হাসাতে পারবে! ভুবনমোহন আর কোন কথা বলেন না।

"ভুবনমোহনের এক জ্ঞাতিবোন তাদের প্রতিবেশিনী ছিলেন। অতি বৃদ্ধা এই ভদ্রমহিলা নাকি গল্প করেছিলেন যে, একবার আশ্বিন মাসে ভুবনমোহন রাধাকান্তপুর থেকে মেহেরপুর যাচ্ছিলেন। সন্ধ্যা আগতপ্রায়। ভৈরব নদের তীর ধরে দ্রুতপদে চলেছেন ভুবনমোহন। হঠাৎ দিগন্ত আলো করে তাঁর অদূরে একটা তারা খসে পড়লো ভৈরবের জলে। এত কাছে পড়লো উল্কাটা যে অতর্কিতে সেই উজ্জ্বল আলোয় চোখ ধাঁধিয়ে অবশের মত দাঁড়িয়ে পড়লেন ভট্টাচার্য মশাই। এর কিছুদিন পরেই জানা গেল মানিকসুন্দরী অন্তঃসত্বা।"

—বাংলার সাধনায় নিগমানন্দ

মানিকসুন্দরী নিরালায় বসে ভাবেন তাঁর অদৃষ্টের কথা। পর পর দুটো মেয়ে হলো, তারাও থাকলো না। এমন কি পাপ তিনি করেছেন যার জন্য তাঁর এই শাস্তি। সংসারে আজ সব থেকেও কিছু নেই। স্বামীর মনে সুখ নেই; সংসারেও তাঁর বিতৃষ্ণা। কারও সঙ্গে ভালভাবে কথাও তিনি বলেন না।

ঠিক এমনি সময়ে রাধাকান্তপুর থেকে ত্রৈলক্য চক্রবর্তী আসেন কুতুবপুরে। মানিকসুন্দরী বাবার বুকে ঝাঁপিয়ে পড়ে কান্নায় ভেঙে পড়েন।

বাবা বলেন: মা, ভগবানকে ডাক, তাঁর কাছেই তোর মনের ব্যথা জানা। তিনি ঠিক তোর মনের কথা শুনবেন।

মানিকসুন্দরী জবাব দেন: বাবা, আমার হতের দানও নাকি অশুদ্ধ!

ত্রৈলক্য চক্রবর্তী কোন কথা বলেন না। একমাত্র কন্যার মুখের দিকে চেয়ে তাঁর হৃদয়ও ভারাক্রান্ত হয়ে ওঠে।

তারপর দীর্ঘদিন কেটে যায়।

একনিষ্ঠ ভাবে পূজার্চনা ও ব্রত উদ্‌যাপনের ফল মিললো। মানিকসুন্দরী সন্তানসম্ভবা হলেন। এ সংবাদ কুতুবপুর ছাড়িয়ে চলে গেলো রাধাকান্তপুর। ভুবনমোহন স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললেন।

মানিকসুন্দরী দেবীর চেহারা দিন দিন দেবীপ্রতিমার মত হতে লাগলো। কি এক অপূর্ব জ্যোতি যেন তাঁর সারা মুখে। তাঁর অপরূপ রূপের ছটাতে বাড়ি ঘর সব আলো হয়ে যায়।

কে এলো গর্ভে?

কোন্ মহামানব তা কে জানে?

দিন যায়। রাত আসে। আবার প্রভাত হয়।

মানিকসুন্দরী যত দিন যায় ততই নানানরকম অনুভূতিতে তাঁর হৃদয় আচ্ছন্ন হয়। কখনও স্বপ্ন দেখেন, কখনও চেয়ে থাকেন আকাশের দিকে। কখনও মনে হয় সারা ঘর ফুলের গন্ধে ভরে গিয়েছে, কখনও মনে হয় তাঁর হৃদয় মন সব দুলছে, কখনও মনে হয় কে যেন ভিতরে বসে গুনগুন করছে, কখনও সন্ধ্যারতির নূপুরের ধ্বনি শুনতে পান। চলতে চলতে কখনও মনে হয় এক ঝলক বাতাসে সুগন্ধী ধূপের গন্ধ ভেসে আসছে।

ভুবনমোহন জপে বসেন।

মানিকসুন্দরী দেবী পাশে এসে গৃহদেবতার দিকে একদৃষ্টে চেয়ে থাকেন। হঠাৎ যেন শুনতে পান কে যেন স্তোত্রপাঠ করছে। মানিকসুন্দরী ছটফট করতে থাকেন, কে পাঠ করছে, কই ঘরে তো কেউ নেই? স্বামী জপে বসে মনে মনে ধ্যান করছেন। তবে কে এই স্তোত্রপাঠ করছে!

ভুবনমোহন বলে উঠেন : কি হলো, অমন করছ কেন?

মানিকসুন্দরী কথা বলেন না—

: কই, কি হলো, বললে না!

: না, কিছু হয় নি তো!

: কিছু যদি নাই হবে তাহলে ওরকম চঞ্চল হলে কেন।

: জানি না। বুঝতেও পারি নে। একটু থেমে পরে বলেন : জানো, তুমি যখন জপ করছিলে আমি তখন শুনলাম কে যেন স্তোত্রপাঠ করছে।

: তোমার মনের ভুল, ও কিছু নয়।

: না গো না, আমি পরিষ্কার শুনেছি—

ভুবনমোহন অবাক্ বিস্ময়ে মানিকসুন্দরী দেবীর দিকে চেয়ে থাকেন।

যত দিন যায় ততই মানিকসুন্দরী দেবী নিত্য নতুন ঘটনা প্রত্যক্ষ করেন আর চমকে যান।

দেখতে দেখতে সময় এসে যায়। মানিকসুন্দরী রাধাকান্তপুর এলেন।

॥ ২ ॥

বাংলার ১২৮৬ সাল। শ্রাবণ মাস—ঝুলন পূর্ণিমা তিথির শুভক্ষণে রাত্রি দুটোর সময় মানিকসুন্দরী দেবী এক দিব্যকান্তি পুত্রসন্তান প্রসব করলেন। কি অপূর্ব যোগাযোগ।

একে শ্রাবণ মাসের ঝুলন পূর্ণিমা, তায় বৃহস্পতিবার। মনে হলো স্বর্গ থেকে কোন এক দেবশিশু মর্ত্যে নেমে এলেন। চারদিকে শঙ্খ কাঁসরধ্বনিতে মুখরিত হয়ে গেলো। সবাই আনন্দে ভাসছে। আকাশের চাঁদও বুঝি উঁকি মেরে দেখলে এই অনিন্দ্যসুন্দর শিশুকে। একি অপরূপ রূপ, এমন রূপ কি মানবশিশুতে সম্ভব?

বাপ-মা নাম রাখলেন নলিনীকান্ত। এমন দেবদর্শন ছেলের নাম নলিনীকান্ত না হলে মানাবে কেন! কুতুবপুরের আবহাওয়ার ভিতর নলিনীকান্ত দিন দিন শশীকলার মত বাড়তে লাগলো। যতই বড় হতে থাকে ততই তার দৌরাত্ম্যে গ্রামেরা সবাই যেন অতিষ্ঠ হয়ে উঠলো। সঙ্গী সাথীদের সঙ্গে জলে ঝাঁপাঝাঁপি, গাছে উঠে ফল পাড়া, গরু বাছুরের খুঁটো খুলে দিয়ে তার পেছনে তাড়া করা, যার তার সঙ্গে মারামারি। এই সব দৌরাত্ম্য করেই তার দিন যায়। পাড়ার লোকের নালিশের অন্ত নেই।

মানিকসুন্দরী সব শোনেন। রাগে তাঁর সর্বাঙ্গ জ্বলে—কিন্তু নলিনী যখন তার সুন্দর মুখখানা হাসিতে ভরে মায়ের সামনে এসে দাঁড়ায় তখন সব রাগ যেন কোথায় চলে যায়।

যুগে যুগে কালে কালে মহাপুরুষরা শিশুকালে বুঝি এমনিই করে থাকেন—দ্বাপরে শ্রীকৃষ্ণের দৌরাত্ম্যের কথা কে না জানে? কলিতে মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্য, প্রভু নিত্যানন্দ, এঁদেরও দৌরাত্ম্যে মানুষ পাগল হয়েছিল। তারপর মহাসাধক বামাক্ষেপা, কমলাকান্ত, ত্রৈলঙ্গস্বামী এঁরা কেউ কম ছিলেন না। নলিনীকান্তও বুঝি এঁদের মতই হবে।

এত দৌরাত্ম্য করে সে বেড়াতো কিন্তু কুতুবপুরের মানুষ তাকে প্রাণ অপেক্ষাও ভালবাসতো।

কতদিন কত লোক নালিশ জানাতে এসেছে তার বাপ-মার কাছে, কিন্তু

ঐ পর্যন্তই। বাড়ির কাছে এসে কি ভেবে আবার ফিরে গেছে। কতদিন গ্রামের লোক তাকে শাসন করবে বলে ধরেছে কিন্তু তার মুখের দিকে চেয়ে কোমল অঙ্গে আঘাত করার বদলে জড়িয়ে ধরে কত আদর করেছে।

নলিনীকান্ত মুখ ভার করে বলেছে: কই মারলে না—

: তোকে মারবো কেন!

: কেন, তোমার গাছের ফল ছিঁড়ে নিয়েছি যে—

: দূর! তুই গাছে হাত না দিলে তো সে গাছ বাড়বেই না। তোর মনে নেই, সেবার তুই রাগ করে আমার লাউ গাছটার কি সর্বনাশ করেছিলি, কিন্তু সেই গাছে যা লাউ হলো তা আর বিক্রি করে শেষ করতে পারি নে।

: তাই আবার হয় নাকি—

: হয় রে হয়। তুই হাত দিলে হয়।

একটু থেমে লোকটা তার হাত ধরে বলে: আয়, আমাদের বাড়ি।

: কেন?

: ভারী সুন্দর সুন্দর পেয়ারা ধরেছে। তুই কয়েকটা না খেলে তো আমার ভালো লাগছে না।

নলিনীকান্ত একটু চুপ করে থেকে বলে: আমার মা গাছের ফল আগে ঠাকুরকে দেয়।

লোকটি হেসে বলে: আমিও তাই দিয়ে থাকি। আজও তো তাই পেয়ারা আগে দিতে চাইছি। চল বাবা, পাখিতে ঠুকরে খেলে তো তোর ভোগে লাগবে না। নে, তাড়াতাড়ি চল।

লোকটা নলিনীকান্তকে একরকম ধরেই নিয়ে গেলো।

নলিনীকান্ত সাত বছরে পড়লো। ভুবনমোহনের এর মধ্যে তারাপদ, দুর্গাপদ, শ্যামাপদ, রামপদ ও নকুল নামে পাঁচটা ছেলে হয়। দুর্গাপদ, নকুল ও শ্যামাপদের ছোটবেলাতেই মৃত্যু হয়।

ভুবনমোহন নলিনীর মতিগতি দেখে চিন্তিত হয়ে পড়েন। এত বড় ছেলে যদি লেখাপড়া না শেখে তাহলে চলবে কি করে! কুতুবপুরে প্রাইমারী স্কুলে নলিনী ভর্তি হলো। সমস্ত দৌরাত্ম্য তার ধীরে ধীরে চলে যেতে থাকে। পড়ার বইতে মন চলে গেলো তার। নলিনীকান্ত অস্থির-চিত্ত হলেও অত্যন্ত মেধাবী ছিল। অল্পদিনের ভিতরই প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পাঠ শেষ করে ফেললো। গুরুমশায় সমস্ত ছাত্রকেই সমান ভাবে স্নেহ করতেন—

নলিনীকান্ত তাঁর যেমন প্রিয় পাত্র ছিল তেমনি তিনি শাসনও করতেন। কতদিন তিনি নলিনীকান্তকে আঘাতে আঘাতে জর্জরিত করেছেন, আবার তাকে আদরও করেছেন। গুরুমশায় যা পড়া দিতেন নলিনীকান্ত যত্নসহকারে পড়ে শেষ করে ফেলতো।

একদিন গুরুমশায় পড়াতে পড়াতে ছাত্রদের জিজ্ঞাসা করলেন: এই 'ভগবান' বানান কর।

কেউ বললো: বড্ড শক্ত!

কেউ বললো: দুই অক্ষরের বানান পড়ছি পণ্ডিতমশায়, চার অক্ষর পর্যন্ত পড়ি নি।

কেউ বললে: ভো—

গুরুমশায় তাকে থামিয়ে দিয়ে বললেন: থাক, আর বলতে হবে না। নলিনী, তুই বল!

নলিনী বললে: এখনও জানতে পারি নি, যেদিন জানবো সেদিন ঠিক বলবো।

: তার মানে!

: মানে সোজা। যেদিন জানবো সেদিন বোলবো। না জেনে যা তা একটা বললে তো মার খেতে হবে।

পণ্ডিতমশায় এবার চটে উঠে তার পিঠে একটা চড় মেরে বলেন: তুই কবে জানবি, সেই শোনার জন্য আমি বসে থাকবো।

নলিনীকান্ত মার খেয়ে কাঁদছে—দু'চোখে তার জলের ধারা গড়িয়ে পড়ছে। পণ্ডিতমশায় তবুও ছাড়বার পাত্র নন। বললেন: ভগবান বানান যে করতে পারে না তার লেখাপড়া ছেড়ে দেওয়াই ভালো।

নলিনীকান্ত এবার রেগে গেলো: বললাম তো, জানলে বলবো। আপনি কি জেনেছেন? বলেই তাড়াতাড়ি সামলে নিয়ে অপরাধীর মত দাঁড়িয়ে থাকলো।

পণ্ডিতমশায়কে এত বড় শক্ত কথা তার বলা উচিত হয় নি। এদিকে গুরুমশায় রাগে অগ্নিশর্মা হয়ে গেছেন।

নলিনীকান্তের কাছে এসে তার কানটা ধরে দুটো শক্ত মোচড় দিয়ে বললেন: হারামজাদা, তোর কাছে আমায় ভগবান বানান শিখতে হবে?

নলিনীকান্ত আর কোন জবাব না দিয়ে বাড়ির পথে পা বাড়ালো।

কলির মানুষ অহংকারের তরী বেয়ে এ ভবসমুদ্রে চলাচল করছে। একটা দমকা হাওয়ায় যে ঐ জীর্ণ তরী তলিয়ে যেতে পারে সে চিন্তাও তার নেই। সকলের কাছেই যে জানবার আছে, শিখবার আছে, এ ধারণা আমাদের নেই। আমি গুরু, আমার চাইতে আর বেশী কে জানে? আমি জ্ঞানী, আমার চাইতে আর কে বেশী বোঝে, এই চিন্তাতেই মানুষের দিন রাত কাটছে। তার পক্ষে আর বেশী কিছু জানবার আর কি থাকতে পারে!

তাই অনবরত ডুবছে এই মানুষ, আবার ভাসছে এই মানুষ। নলিনীকান্ত বুঝেছে যে, ভগবান সম্বন্ধে তার যখন কোন জ্ঞান নেই তখন সে তার কথা কি করে জানবে।

উত্তরকালে এই নলিনীকান্ত জেনেছিল, ভগবান কি; তাঁকে প্রত্যক্ষ করেছিল সে; সবাইকে জানিয়েছিল, ভগবানের স্বরূপ কি; কি করে তাঁকে ডাকতে হয়; কেমন করে তাঁকে লাভ করা যায়।

যুধিষ্ঠির চট্টোপাধ্যায় ভুবনমোহনের জ্ঞাতি ভাই। তিনি নলিনীকান্তকে খুব ভালোবাসতেন। নলিনীও তাঁর সঙ্গে প্রায়ই তাঁর বাড়িতে যেতো, রাতে থাকতো, আবার খেয়াল-খুশীমত চলে আসতো। চাটুয্যেমশায়েরও কোনো সন্তানাদি ছিল না, তাই নলিনীকে ছেলের মতনই দেখতেন। ভালোমন্দ জিনিস তাঁর বাড়িতে হলে নলিনীকে কাছে না পেলে তাঁর সে জিনিস মুখে উঠতো না। কতদিন রাত-বিরেতেও এসে ঘুমন্ত নলিনীকে তুলে নিয়ে বাড়ি গেছেন।

ভুবনমোহন মাঝে মাঝে রহস্য করে বলতেন: ছেলে বাপু তুমি নিয়ে যাও যুধিষ্ঠির।

: তা দাও না ওকে, আমি নিয়ে যাই। রোজ রোজ এ আর ভালো লাগে না।

মানিকসুন্দরী হাসেন।

যুধিষ্ঠির হেসে জবাব দেন: খেতে বসে দেখি তালের বড়া। মনটার ভিতর যেন মোচড় দিয়ে উঠলো। বারে বারে হাত ধুই কিন্তু আর খেতে পারি নে। শেষে গিন্নী বলে ওঠে, যাও, নলিনীকে নিয়ে এসো; ও না এলে আর তোমার খাওয়া হবে না। এদিক ওদিক চেয়ে বলে ওঠেন: কই রে নলিনী, ওদিকে যে সব ঠাণ্ডা হয়ে গেলো।

নলিনী যেন তৈরি হয়েই ছিল। এক পাশ থেকে বললে : কাকামণি, যাই।

রাতের অন্ধকারে নলিনীকান্ত যুধিষ্ঠির চাটুয্যের হাত ধরে চলে গেলো।

ভুবনমোহন মানিকসুন্দরীর দিকে চেয়ে বলেন : নলিনীকে সবাই বড় ভালোবাসে। মাঝে মাঝে মনে হয় ওকে সবাই টুকরো টুকরো করে ছিনিয়ে নিচ্ছে আমাদের কাছ থেকে।

মানিকসুন্দরী স্বামীর দিকে চেয়ে বলেন : তা নিক, তাতে আমার এতটুকু দুঃখ নেই। সকলের মনে যাতে ওর ঠাঁই হয়, ভগবান তাই ওকে করুন। সকলের ভালোবাসা পেয়ে ও বড় হোক। আমার তাতেই সুখ তাতেই শান্তি।

॥ ৩ ॥

একদিন সন্ধ্যার কিছু আগে নলিনীকান্ত কাকামণির বাড়ি গিয়ে উপস্থিত। যুধিষ্ঠির চট্টোপাধ্যায় বাড়ি ছিলেন না। কাকীমা তাকে দেখে আদর করে কাছে বসালেন। গালে একটা চুমু খেয়ে বললেন: তুই এসেছিস, ভালোই হয়েছে। আজ একটু পায়েশ রাঁধবো। তুই এসেছিস ভালোই হলো, তোর কাকামণির আর দৌড়াতে হবে না।

সন্ধ্যা হয় হয়। গ্রাম-পাড়াগাঁ; চারদিকে অন্ধকার ঘনিয়ে এলো। গাছে গাছে জোনাকির মেলা বসে গেলো। নলিনীকান্ত ঘরের দাওয়ায় বসে ঐ অন্ধকারের দিকে চেয়ে চেয়ে কি যেন দেখছিল। এমন সময় কাকীমা এসে তার হাতে একটা প্রদীপ দিয়ে বললেন: বাবা, যা, চণ্ডীমণ্ডপে আলোটা জ্বেলে দিয়ে আয়।

নলিনীকান্ত প্রদীপ হাতে করে চণ্ডীমণ্ডপে উঠেছে এমন সময় হঠাৎ মেঝের ওপর দপ্ করে আগুন জ্বলে উঠলো। সেই আগুনের ভিতর দশভূজার মূর্তি প্রকাশ পেলো। নলিনীকান্ত দশভূজা মূর্তি দর্শন করে ভয় পেয়ে প্রদীপ রেখে দিয়ে দৌড়ে এসে কাকীমাকে জড়িয়ে ধরে ভয়ে কাঁপতে লাগলো।

কাকীমা সব শুনে বললেন: বহু পুণ্যফলে তুই ঐ মূর্তি দর্শন করেছিস। সবার ভাগ্যে কি আর ঐ দেখা ঘটে?

নলিনীকান্ত আর কোন কথা বলে নি সেদিন।

পরদিন বাড়ি গিয়ে মা'র কাছে সব বলতেই মানিকসুন্দরী তাকে বুকে জড়িয়ে ধরে বললেন: বহু ভাগ্য তোর, তাই তুই দশভূজার দর্শন পেয়েছিস, আর আমারও কম ভাগ্য নয় তোর মত ছেলে পেটে ধরেছি বলে।

নলিনীকান্ত বলে: মা, তোমার তো দুটো হাত আর দেবতার বুঝি দশটা হাত?

: হ্যাঁ বাবা, দেবতা ও মানুষে তাইতো এত তফাৎ।

: আচ্ছা মা, চণ্ডীমণ্ডপে কেমন করে ঐ মূর্তি এলো?

: উনি যে জগৎপালিকা। এই দুনিয়াটাই তো উনি পালন করছেন। ওঁর পক্ষে সবই সম্ভব।

: সব সময় তো ওঁকে দেখতে পাই নে—

মানিকসুন্দরী তার মাথায় হাত বোলান আর বলেন: সেরকম ভক্তি থাকলে সব সময়ই ওঁকে দেখা যায়।

: ভক্তি কি মা?

: তোর বাবার কাছে জেনে নিস বাবা। আমি অতি-সাধারণ মানুষ, আমি কি আর অত বুঝি?

: কেন, তুমি তো মা—

: ওরে পাগল, মা হলেই কি সব জানা যায়? শুধু শুনে রাখ, ভক্তি হচ্ছে মুক্তির একমাত্র পথ।

: মুক্তি কি মা?

মানিকসুন্দরী বিরক্ত হয়ে বলেন: ভালো করে লেখাপড়া শেখ; সব জানতে পারবি।

আর একদিন রাত্রে নলিনীকান্ত তার বিছানায় শুয়ে আছে। হঠাৎ গভীর রাতে সহসা তার ঘুমের ঘোর কেটে গেলো। ওপরে ছাদের দিকে চেয়ে দেখে চাঁদের আলোয় ঘর ভরে গেছে। কৃষ্ণপক্ষের রাতে এমন চাঁদের আলো কোথা থেকে এলো! নলিনীকান্ত উঠে বসলো। পরে যেদিকে তাকায় সেইদিকেই চাঁদের আলো। এ কি করে সম্ভব! জানলা খুলে দিলো। বাইরে অন্ধকার, অথচ সে যেদিকে তাকাচ্ছে সেই দিকেই আলো। অনেকক্ষণ ধরে সে চিন্তা করলো, পরে সে বুঝতে পারলো, এ আলো তার নয়ন থেকে বের হচ্ছে।

নলিনীকান্ত প্রাথমিক স্কুলের পড়া শেষ করে দারিয়াপুর মধ্য ইংরাজী স্কুলে ভর্তি হলো। তখন তার বয়স এগার। ভুবনমোহন এক শুভদিন দেখে নলিনীকান্তের উপনয়ন দিলেন। পৈতা হবার পর নলিনীকান্তের মনে ধর্মভাব জাগ্রত হলো। কিন্তু কয়েক মাস পর তার সে সব ভাব যেন কোথায় চলে গেলো। নিত্য সন্ধ্যা-আহ্নিকও মনোযোগ দিয়ে করে না। ধীরে ধীরে দেব-দেবতার ওপর ভক্তি, তাও তার যেন থাকছে না। যে প্রায় একটা না একটা দৈব ঘটনা দর্শন করতো তার এ পরিবর্তন কেন হলো।

নলিনীকান্ত ঘোর নাস্তিকে পরিণত হলো। না, কিছু নেই, দেব-দেবতা সবই চোখের ধাঁধা। একমাত্র সেই কালে কালে যুগে যুগে—এই সত্যই বড় সত্য। মানুষই দেবতা, মানুষই ব্রহ্ম। কিন্তু এই নাস্তিকতার ভাব তার

বেশী দিন থাকে নি। এই ভাব আসার পর সে প্রায়ই নানানরকম স্বপ্ন দেখতো।

শ্রীশ্রীঠাকুরের বাল্যকালের অদ্ভুত স্বপ্নের কথা "শ্রীশ্রীনিগমানন্দের জীবনী ও বাণী" বইতে নিজেই শ্রীমুখে বলেছেন—

"ছোটবেলায় প্রায়ই আমি একটা স্বপ্ন দেখতাম। আমি ঘরে শুয়ে আছি। একজন মহাপুরুষ এসে আমায় ডাকতেন। আমি তাঁর শব্দই শুনতে পেতাম কিন্তু দেখতে পেতাম না। তাঁর ডাক শুনে আমি বিছানা হতে লাফিয়ে উঠে তাঁর সঙ্গে সঙ্গে চলতে আরম্ভ করতাম। চলতে চলতে এমন এক রাজ্যে এসে পড়তাম সেখানে না আলোক না অন্ধকার। যেমন জ্যোৎস্না রাত্রি অথচ অল্প অল্প মেঘ থাকলে যেমন হয়। তারপর চলতে চলতে এসে একটা সরোবরের পাশে দাঁড়াতাম। তখন দেখতাম কি না সরোবরে একটা পদ্ম ফুটে রয়েছে। সেই মহাপুরুষ গিয়ে বিকশিত পদ্ম ফুলটার মাঝে দাঁড়াতেন, দাঁডাতে দাঁড়াতে দেখতাম তিনি যেন ক্রমশঃ উর্ধ্বে উঠছেন আর তাঁর সঙ্গে যেন আমিও একটা সূতো দিয়ে জড়ানো—আমিও তাঁর সঙ্গে সঙ্গে ওপরে উঠে যাচ্ছি। এই ভাবে ওপরে উঠতে উঠতে অনেক উঁচুতে উঠে যেতাম। তারপর দেখতাম, তিনি যেন মাঝখানের যোগসূত্রটা কেটে দিতেন, আর আমি ঘুড়ির মত ঘুরতে ঘুরতে এসে নীচে নেমে পড়তাম। এই দেখতে দেখতেই হঠাৎ ঘুম ভেঙে যেতো। আরও একবার একটা স্বপ্ন দেখি। সে স্বপ্নে কুল-কুণ্ডলিনীকে জাগ্রত করে মূলাধার প্রভৃতি চক্র ভেদ করে উঠতে লাগলাম, ক্রমে ক্রমে সপ্তলোক পার হয়ে ভাবলোকেও উঠলাম, কিন্তু নামবার সময় যে কি করে নামবো, এই ভাবতেই ভয় হলো, অমনি স্বপ্ন ভেঙে গেলো।"

দারিয়াপুর স্কুলে পড়ার সময় কৃষ্ণবন্ধু পালের সঙ্গে নলিনীকান্তর ভারী বন্ধুত্ব। ধর্মের গোঁড়ামী, মনের সংকীর্ণতা সবই তার দূর হয়ে গিয়েছিল। সে যে বর্ণশ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ হয়ে সকলের বাড়ি যায়, খায়-দায়, এতে অনেকের চোখেই খারাপ লাগতো। কিন্তু নলিনীকান্ত নির্বিকার। যে মহৎ হয়, যে সৎ হয়, যে সকলের ভালোবাসা পাবার জন্য কাঙাল হয়, তার সব লক্ষণই শৈশব থেকেই প্রকাশ পায়। নলিনীকান্ত একদিন যে বিরাট বটবৃক্ষ হবে, তার স্নেহচ্ছায়া যে বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন মানুষের আশ্রয়স্থল হবে, এ অনেকেরই জানা ছিল। মানুষের প্রতি যার এত মমত্ববোধ, কে ছোট, কে বড় সে বিচার

যার নেই, কে শুচি, কে অশুচি এ ভেদবুদ্ধি যার নেই, সেই তো পৃথিবীতে বড় হয়। মহৎ প্রাণ মানুষ হয়, দেশগৌরব হয়।

কৃষ্ণবন্ধু পাল অবস্থাপন্ন ঘরের ছেলে। জাতিতে কুমোর হলেও তাদের শাঁখার ব্যবসা ছিল। নলিনীকান্ত তার বাড়িতে আসে আপনজনের মত। এতে কৃষ্ণবন্ধুর খুব সংকোচ হতো।

একদিন কৃষ্ণবন্ধু হাসতে হাসতে তাকে বললো: হ্যাঁ রে নলিনী, তুই তো সাত্ত্বিক বামুনের ছেলে। নিজেও তো সন্ধ্যা-আহ্নিক করিস। আমার সঙ্গে যে এত মেলামেশা করিস, তোকে কেউ কিছু বলে না?

নলিনীকান্ত জবাব দেয়: শাঁখ আর শাঁখা নিয়ে কারবার করতে গিয়ে জীবনটাকে ফাঁকা করে ফেলেছিস। শোন, নলিনীকান্ত মানুষ বুঝেই বন্ধুত্ব করে। তুই কে জানিস?

: না!

: তুই হচ্ছিস কৃষ্ণের বন্ধু; তাই তুই আমারও বন্ধু। যার তার সঙ্গে তো আমি বন্ধুত্ব করতে পারি নে। আর দেখ, তুই যা বলছিস তা আমি সব বুঝতে পেরেছি। তুই কুমোর আর আমি বামুন, এই তো? দূর বোকা—

কৃষ্ণবন্ধু পাল হাসতে থাকে—

এমন সময় কৃষ্ণবন্ধুর মা এসে দাঁড়ান ওদের মাঝখানে: কি হলো বাবা নলিনী?

নলিনী বলে শুধু: এ জন্মে আমি তরে গেলাম মা, উদ্ধার হয়ে গেলাম। আর আমায় বার বার জন্ম নিতে হবে না।

: কেন রে—

: কেন! স্বয়ং ভগবান কৃষ্ণ যার বন্ধু, সে যে আমারও বন্ধু।

নলিনীকান্ত চলে যায়।

কৃষ্ণবন্ধু দাঁড়িয়ে থাকে।

তার মা বলেন: বামুন বাড়ির ঐ নলেটাকে মাঝে মাঝে মনে হয়, ও মানুষ নয়!

॥ ৪ ॥

সাহিত্য-সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র সম্পর্কে নলিনীকান্তর দাদামশায়। নলিনীকান্ত ফাঁক পেলেই নৈহাটী এসে তাঁর বাসায় এসে থাকতো। কি অদ্ভুত জোট! একজন সাহিত্য-সম্রাট ও ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট আর একজন চোদ্দ বছরের বালক। বঙ্কিমচন্দ্র নলিনীকান্তকে খুব ভালোবাসতেন। তার সঙ্গে ধর্মালোচনা করতেন। নলিনীকান্তের একটুও ভয় ছিল না। যেহেতু তিনি সাহিত্য-সম্রাট সেহেতু তাঁর কথাই যে অকাট্য, এ যুক্তি নলিনীকান্ত মানতে রাজী নয়। যে সময়কার কথা বলছি সেই সময় হয়তো বঙ্কিমচন্দ্রের 'কৃষ্ণচরিত্র' ও 'ধর্মতত্ত্ব' প্রকাশিত হয়েছে। 'কৃষ্ণচরিত্র' অধ্যাত্ম তত্ত্ব বিসর্জিত করে মানুষের দরবারে যুক্তি তর্ক দিয়ে যে এক অতি মানবের চরিত্ররূপে বর্ণনা করেছেন এবং মানুষের মনে বিশ্বাসের ভিত্তিতে তা প্রতিষ্ঠিত করেন নি, তা দেখে নলিনীকান্ত খুশীই হয়েছিল।

সাহিত্য-সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র নলিনীকান্তর ভিতরে এক বিরাট ব্যক্তিত্বের বীজ নিহিত আছে তা সেইদিনই বুঝতে পেরেছিলেন। তাঁর সেদিনের সে কথা আজ সত্যে পরিণত হয়েছে।

নলিনীকান্ত দারিয়াপুর ইংরাজী স্কুল থেকে পাস করলো। এই সময়ে তার মাতৃবিয়োগ ঘটে। ভুবনমোহন মানিকসুন্দরীকে হারিয়ে শোকে একেবারে ভেঙে পড়লেন। নলিনীকান্তও এই বয়সে মাকে হারিয়ে সারা দুনিয়া যেন অন্ধকার দেখলো।

নিরিবিলি একা যখন থাকে তখনই মানুষের দেহের এই নিদারুণ পরিণতি দেখে বড় চিন্তিত হয়ে পড়ে। —এই তো জীবনের পরিণাম? এই দেহের জন্য মানুষের পরিচর্যার শেষ নেই। এই দেহের জন্য কত গর্ব। এই দেহের জন্য মানুষের কত না ব্যর্থ প্রসাধন। সব তো শেষ হয়ে গেলো। মানুষ হয়ে দুনিয়ায় আসার এই পরিণাম!

নলিনীকান্ত দেশের কাজে আত্মনিয়োগ করলো। মানুষের ব্যথা তার নিজের ব্যথা হয়ে দেখা দিলো। মানুষের দুঃখ-কষ্টের যেন ভাগীদার হলো। জীবসেবা যদি ধর্ম হয়, জগতে দয়া যদি ঈশ্বরের সেবা হয়, তবে তাই করবেন

তিনি। মন্দিরে বসে পাথরের দেবতা পুজো করে কি হবে? মানুষ জীবন্ত দেবতা, এই পুজোতেই সে সর্ব প্রাণ-মন ঢেলে দিলো। যেখানে যত পতিত আছে, যাদের ছায়া কেউ মাড়ায় না, সে তাদের মাঝে মিশে গেলো।

ভুবনমোহন চিন্তিত হয়ে পড়লেন। কেউ কেউ এসে তাঁর কাছে অভিযোগও করলেন যে, নলিনীর এই বাড়াবাড়ি তাঁদের চোখে ভালো লাগছে না। এর প্রতিকার না হলে ব্রাহ্মণকে কেউ মানবে না।

ভুবনমোহন সমস্তই শুনলেন। প্রতিকারও করবেন বলে প্রতিশ্রুতি দিলেন। কিন্তু তিনি তো জানেন, তাঁর নলিনী কোন অন্যায় কাজ করতে পারে না। কেন না অন্যায় নলিনী কোনদিনই সহ্য করতে পারে না।

একদিন নলিনীকান্ত বিকেলের দিকে বাড়ি ফেরবার পথে এক বাড়িতে এক বৃদ্ধার কান্না শুনে সে বাড়িতে ঢুকে পড়ে দেখলো যে, এক দজ্জাল পুত্রবধূ তার শাশুড়ীকে নির্মম ভাবে মারছে। নলিনীকান্ত এ দৃশ্য দেখে সহ্য করতে না পেরে বৌটাকে আঘাতে আঘাতে জর্জরিত করে সোজা বাড়ি চলে এলো।

পরদিন তারা ভুবনমোহনের কাছে এসে ভয় দেখিয়েছিল আদালতে মামলা দায়ের করবে বলে, কিন্তু তাদের নিজেদের ভুল বুঝে আর অতদূর পর্যন্ত অগ্রসর হয় নি।

যত দিন যেতে থাকে ভুবনমোহন ততই যেন চিন্তার সমুদ্রে হাবুডুবু খান। নলিনীকান্ত দিন দিন যেভাবে অগ্রসর হচ্ছে তাতে যে কোন মুহূর্তে একটা বিপদ হতে পারে। তাই ঠিক করলেন নলিনীকে বাঁধতে হবে। একটা সুলক্ষণা কন্যার আঁচলে তাকে শক্ত করে বাঁধতে পারলে নিশ্চয়ই তার মতিগতির পরিবর্তন হবে।

তিনি সুপাত্রীর সন্ধান করতে লাগলেন। খোঁজ করে জানতে পারলেন গঙ্গার ধারে হালিশহরে বৈদ্যনাথ মুখোপাধ্যায়ের এক সুলক্ষণা কন্যা আছে। কন্যার পিতা চুঁচুড়াতে জজের পেশকার ছিলেন—কয়েক বছর হলো দেহত্যাগ করেছেন। তাঁর বিধবা পত্নী অসহায় অবস্থায় দুটি মেয়ে নিয়ে কোনমতে দিন যাপন করছেন।

ভুবনমোহন নিজেই মেয়ে দেখে কথাবার্তা ঠিক করে এলেন। নলিনীকান্ত তখন আঠারো বছরে পড়েছে। ভুবনমোহন মনে মনে উৎফুল্ল হলেন—

সংসার ঘাড়ে পড়লে সব ঠিক হয়ে যাবে। সংসারের বোঝা ঘাড়ে পড়ার পর কত বড় বড় মহারথী ঠাণ্ডা হয়ে গেছে। নলিনীকান্তও এবার সোজা হবে।

১৩০৪ সালে তেরো বছরের মেয়ে সুধাংশুবালাকে বিয়ে করে ঘরে নিয়ে এলো নলিনীকান্ত।

ভুবনমোহন সুখী হলেন। দুঃখে ভেঙে পড়লেন মানিকসুন্দরীর কথা ভেবে, নলিনীর এমন সুন্দরী বৌ দেখবার আর ভাগ্য তার হলো না। সবার অলক্ষ্যে দু'ফোঁটা চোখের জলও পড়লো মানিকসুন্দরীর কথা ভেবে।

সুধাংশুবালাকে ঘরে এনে ভুবনমোহন তাকে আদর করে কাছে টেনে নিলেন। এত আনন্দের মাঝেও তাঁর চোখ দুটো জলে ভরে এলো। বললেন: মা, আজ তোমার শাশুড়ী নেই। এ সংসার এখন তোমার, আর আমার নলিনীর ভার তোমার হাতে দিয়ে আমি নিশ্চিন্ত হলাম। এই কথা বলে তিনি অন্য কাজে চলে যান।

রাতের বেলায় নলিনীকান্ত আর কোথাও বের হন না। ঘরে বসে পড়ে তিনি ওভারসিয়ারী পাস করলেন। হঠাৎ তাঁর লোকশিক্ষা দেবার বাসনা জাগায় তিনি যাত্রাদল খুললেন। তিনি নিজেই পরিচালক, লেখক ও প্রধান অভিনেতা হলেন।

গ্রামের লোকের কোন আনন্দ নেই—তারা দিনরাত যার যার বৃত্তি অনুযায়ী কাজ করে, ব্যস, ঐ পর্যন্তই। আর কোন কিছু নেই। এই জীবনের বাইরেও যে আর একটা জীবন আছে, সে সন্ধান এদের দিতে হবে। এমন সুন্দর পৃথিবী! গাছে ফুল ফোটে, পাখি গান গায়, ভ্রমর গুঞ্জন করে, আকাশে চাঁদ ওঠে, এ সব এরা কিছুই চোখে দেখে না।

তিনি 'তরণীসেন বধ' নাটক লিখলেন।

একদিন রাতে নলিনীকান্ত বাড়িতে রয়েছেন। সুধাংশুবালাও কি কাজে ব্যস্ত রয়েছে। এমন সময় তাঁর গলা শোনা গেলো:

"কে আমি?
কোথা হতে এসেছি আমি এখানে
পূর্বেতে ছিলাম কোথা?
কোথায় যাইবো পরেতে?

এ স্বপন অনুক্ষণ জাগে হৃদে
যবে মনে হয় সকল কথা।
বিঘূর্ণিত হয় মস্তিষ্ক আমার
হস্তপদ করে ঝিন ঝিন
ডুক্ ডুক্ কাঁপে দেহ।"

সুধাংশুবালা ছুটে আসে : ওগো, কি হলো তোমার ?

নলিনীকান্ত একটু হেসে বলেন : 'তরণীসেন বধ' লিখেছি আমি। সামনের পুজোয় বই নামাবো। তারই রিহার্সাল দিচ্ছিলাম।

: তাও ভালো, আমি ভাবলাম কি হলো বুঝি। সুধাংশুবালা মুখটা নীচু করে বললো : যা বললে তার মানে কি গো ? আমাকে একটু বলো না।

: ওসব তুমি বুঝবে না।

: তুমি আমাকে বুঝিয়ে দিলে ঠিক বুঝবো। এ দুনিয়া সম্বন্ধে আমি কি জানি ? তুমি যদি আমাকে বুঝিয়ে না দাও তাহলে আমি আর কার কাছে জানতে যাবো।

নলিনীকান্ত স্ত্রীর দিকে চেয়ে বললেন : কথাগুলো রাবণের।

: কিন্তু লিখেছো তো তুমি !

: হ্যাঁ, লিখেছি আমি—

সুধাংশুবালা এবার আবদারের স্বরে বলে : একটু বুঝিয়ে দাও কি ওর মানে।

নলিনীকান্ত একটু অন্যমনস্ক হয়ে গেলেন। তাঁর মন যেন ছুটে যায় তরণীসেনের কাছে—তরণীসেন যুদ্ধে চলেছে। রাম বিষ্ণু অবতার ; তার সঙ্গে যুদ্ধ। জননী সরমা শোকে কাতরা। তরণীসেন জননীকে প্রণাম করে যুদ্ধে যাওয়ার কথা নিবেদন করে।

সুধাংশুবালা বলে ওঠে : কই, বলো !

নলিনীকান্তর যেন এতক্ষণ পরে স্ত্রীর কথা মনে পড়লো। মুখটা নীচু করে বললেন : সুধাংশু, একখানা রামায়ণ এনে দেবো, তুমি পড়ো, তাহলে সব বুঝতে পারবে।

: তুমিই তো আমার রামায়ণ। আমার কি বই পড়ে বোঝবার জ্ঞান আছে ?

নলিনীকান্ত বলে যান : সুধাংশু ! জননী সরমা বিষাদে মগ্ন ; তরণীসেন বলছে—

"শুনিয়াছি সর্বশাস্ত্রে বেদের লিখন।
তুমি মাতা বিষাদ ভাবিছ কি কারণ॥
কে কারে মারিতে পারে, কেবা কার রিপু।
এক বিষ্ণু বিশ্বময় ভিন্ন ভিন্ন বপু॥
কালেতে করয়ে লয় উৎপত্তি প্রলয়।
মিথ্যা কেন ভাব মাতা মরণের ভয়॥
শুনেছি পিতার মুখে মহাযোগ তন্ত্র।
অনিত্য শরীর এই মিছে মায়া যন্ত্র॥"

"অস্থির হইল রণে রাম রঘুমণি।
রামেরে কাতর দেখি ভাবিছে তরণী॥
শ্রীরামের পরিশ্রম হয়েছে অধিক।
দারা-সুত মিছা মায়া সকলি অলীক॥"

নলিনীকান্ত একটু থেমে বললেন : সুধাংশু ! সবই যখন অনিত্য, তখন কিসের মায়া ! তাই আমি লিখেছি—আমি কে !

: তুমি আমার সব, ইহকাল পরকাল।

নলিনীকান্ত হেসে বলে : সুধাংশু, আমার এই দেহটাই তো তুমি, এই দেহ না থাকলে তুমি কেউ নয়। যাক, ওসব কথা বাদ দাও। ভাবছি এবার চাকরির খোঁজ করবো। একটা সন্ধানও পেয়েছি।

: কোথায় গো !

: দিনাজপুর ডিস্ট্রিক্ট বোর্ডে—

: ওরে বাবা, সে আবার কোথায় ?

: এখান থেকে অনেক দূর।

: আমি তাহলে একা একা থাকবো কি করে ?

: কেন, তুমি যাবে নাকি আমার সাথে ?

: যাবো। তোমাকে একা ছেড়ে দিতে মন চায় না। মনে হয় চোখের আড়াল হলে আর তোমাকে ফিরে পাবো না।

: তোমাকে ছেড়ে আমারও তো থাকা সম্ভব নয়। সারা মন-প্রাণ জুড়ে তোমার অস্তিত্ব আমার মাঝে।

: আমি না থাকলে তোমাকে কে দেখবে?

: যখন তুমি আসো নি তখন কে দেখেছিল? কিন্তু আমি ভাবছি বাবার কথা। বাবাকে কে দেখবে! না সুধাংশু, সে হয় না। বাবার কষ্ট হবে সেটা আমি চাই না। আমি বরং মাঝে মাঝে এসে তোমাকে দেখে যাবো। আর একটা কথা কি জানো, কাছে থাকলে টান থাকে না। দূরে থাকলে বেশ টান থাকে।

: বেশ, তোমার যা ইচ্ছে—

ভুবনমোহন শুনে খুশী হলেন, কিন্তু দুঃখীত হলেন, যখন শুনলেন যে নলিনী সুধাংশুবালাকে নিয়ে যাবেন না। কিন্তু দেখা গেলো নলিনীকান্তর কোনো কথাই খাটলো না। ভুবনমোহন নলিনীর সঙ্গে সুধাংশুবালাকে পাঠিয়ে দিয়ে নিশ্চিন্ত হলেন। বৌ কাছে না থাকলে ছেলে যদি অন্যরকম হয়ে যায় এই চিন্তা করেই তিনি নলিনীকে একা পাঠালেন না।

নলিনীকান্ত সুধাংশুবালাকে প্রাণ অপেক্ষা প্রিয়তর মনে করতেন—তাই সুধাংশুবালা তাঁর বিদেশের সাথী হওয়ায় তিনি মনে মনে সুখীই হলেন।

নলিনীকান্ত ট্রেনে চেপে সুধাংশুবালার দিকে চেয়ে বললেন: মনে ভারী আনন্দ হচ্ছে তোমার?

সুধাংশুবালা জবাব দেয়: কোন্ মেয়ের তার স্বামীর ঘর করতে আনন্দ হয় না? তোমাকে সব সময় দেখবো, সব সময় কাছে পাবো, এর চেয়ে আর কি আনন্দ আমার থাকতে পারে?

নলিনীকান্ত জানলার বাইরে তাকিয়ে থাকেন।

সুধাংশুবালার জীবনে বিদেশ-যাত্রা এই প্রথম, তাই সারা মন তার আনন্দে টলমল করছে।

নলিনীকান্ত সুধাংশুবালার কানের কাছে মুখ নিয়ে বললেন: বড্ড বেশী ভালোবাসা তোমার। এত ভালো নয়, পরে কেঁদেও কূল পাবে না।

: ভালোবেসে কাঁদতেই হয়। কে না ভালোবেসে কেঁদেছে? শ্রীরাধিকা কেঁদেছিলেন, কেঁদেছিলেন সীতা, কেঁদেছিলেন বিষ্ণুপ্রিয়া, কেঁদেছিলেন চণ্ডীদাসের রামী, কেঁদেছিলেন মীরা। আমিও না হয় কাঁদবো।

: এ সব জানলে কি করে—

: তোমার কাছেই তো শিখেছি—

আর কোন কথা নেই। সুধাংশুবালার একটু তন্দ্রা এসেছিল। নলিনীকান্ত একদৃষ্টে তার ঘুমন্ত মুখখানার দিকে চেয়েছিলেন।

ট্রেন চলেছে উদ্দাম গতিতে। কামরায় যাত্রীও বেশী নেই। হঠাৎ তন্দ্রার ঘোরে সুধাংশুবালা ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠলো। নলিনীকান্ত হকচকিয়ে বললেন : কি হলো সুধাংশু, ওরকম করলে কেন?

কোন কথা না বলে স্বামীর কাছ ঘেঁষে বসে সুধাংশুবালা এদিক ওদিক চাইতে থাকে।

: বলো, কি হয়েছে সুধাংশু!

সুধাংশুবালা বললে : আমার বড় ভয় হয়!

: কেন!

: স্বপ্ন দেখছিলাম। কে যেন তোমাকে আমার কাছ থেকে কেড়ে নিয়ে যাচ্ছে।

: দূর, স্বপ্ন কি আবার কখনও সত্যি হয়?

ট্রেন এসে দিনাজপুরে থামলো।

নলিনীকান্ত আর সুধাংশুবালা দুজন নেমে পড়লেন। বিরাট পৃথিবীর এ দুই নব আগন্তুক নোতুন ঘর বাঁধতে চলেছেন। হয়তো সুখের ঘর— হয়তো……………। কে জানে—

॥ ৫ ॥

দিনাজপুরের কর্মজীবন বেশ ভালোভাবেই চলছিল নলিনীকান্তর। হঠাৎ একদিন অপ্রত্যাশিত ভাবে একটা ভালো সুযোগ এসে গেলো। এই জিলারই নারায়ণপুর গ্রামে রানী রাসমণি স্টেটে সুপারভাইজারী পদটি তাঁর মিলে গেলো। মাইনেও বেশী। পরিবার নিয়ে থাকার ঘরও পাওয়া যাবে। সব দিক দিয়ে সুবিধা।

নলিনীকান্ত সেখানে গিয়ে প্রায় ছ' মাস থাকার পর পিতার পত্রে জানতে পারলেন যে সেখানে লোকাভাবে সব অচল হবার উপক্রম হয়েছে, তদুপরি তাঁরও বেশ কষ্ট হচ্ছে; সুতরাং এসময় নলিনীকান্ত যদি অসুবিধা মনে না করে তাহলে যেন কয়েক মাসের জন্য বৌ সাথে করে এনে রেখে যায়।

নলিনীকান্ত সঙ্গে সঙ্গে সুধাংশুবালাকে নিয়ে কুতুবপুরের দিকে রওনা হলেন।

ভুবনমোহন নলিনীর পিতৃভক্তিতে যারপরনাই সন্তুষ্ট হলেন ও মনে মনে সহস্র আশীর্বাদ করলেন। নলিনীকান্ত অল্প কয়দিনের ছুটি নিয়ে এসেছিলেন, তাই ছুটি শেষ হয়ে গেলে যাবার আয়োজন করলেন। যাবার আগের দিন থেকেই সুধাংশুবালার মন খারাপ হয়ে গেলো। সারাদিন মনমরা হয়ে ঘুরে বেড়ালো। রাতে শোবার পর সেই যে কান্না শুরু করলো সেই কান্না আর থামে না। নলিনীকান্ত যত বোঝান সেও তত কাঁদে। চোখের জলে তার বুক ভেসে গেলো। সুধাংশুবালার কান্না দেখে নলিনীকান্ত কেমন যেন হয়ে গেলেন।

নলিনীকান্ত সুধাংশুবালাকে বুকের মধ্যে টেনে নিয়ে বললেন: ছি! লক্ষ্মীটি, কাঁদে না। আমি খুব তাড়াতাড়িই আবার ফিরবো। এরকম করে কাঁদলে আমার তো যাওয়াই হবে না, শেষে চাকরিটা হারালে দিন চলবে কি করে? অত অবুঝ হয়ো না।

সুধাংশুবালা জলভরা চোখেই বলে: বার বার মন কেন বলছে যে তোমার সাথে আমার আর দেখা হবে না।

: কে এ সব তোমাকে বললে—তোমার সঙ্গে আমার যে জন্ম-জন্মান্তরের সম্বন্ধ; আমি ছাড়া তুমি নয়।

সুধাংশুবালা বললো : কত জন্মের সুকৃতির ফলে তোমার মত স্বামী পেয়েছিলাম আমি। অত সুখ আমার সইবে কেন !

—এ সব কেন তুমি বলছ !

নলিনীকান্তের রাত ভোর হলো সুধাংশুবালার চোখের জলের ফোঁটা গুনে। কেঁদে কেঁদে চোখ ফুলেছে সুধাংশুবালার। সারা মুখে যেন কে কালি ছিটিয়ে দিয়েছে।

নলিনীকান্তর যাবার সময় হলো।

ভুবনমোহনকে প্রণাম করে সুধাংশুবালার কাছে গেলেন।

চিত্রবৎ দাঁড়িয়ে আছে সুধাংশুবালা, মুখে কোন কথা নেই। শুধু চোখে জল। সুধাংশুবালা গলায় কাপড়ের আঁচলটা জড়িয়ে প্রণাম করে উঠে দাঁড়ালো। নলিনীকান্ত বললেন : সাবধানে থেকো, বাবার দিকে নজর রেখো আর প্রতি সপ্তাহে একখানা করে পত্র দিও।

নলিনীকান্ত বাড়ি থেকে বেরিয়ে এসে গরুর গাড়িতে গিয়ে উঠলেন। নলিনীকান্তর চোখ দুটোও আজ কেন জলে ভরে এলো তা কে জানে। গরুর গাড়ি ছেড়ে দিলো।

সুধাংশুবালাকে রেখে আসার পর মাস তিনেক কেটে গেছে। রেখে আসার পর পরই বোধহয় কয়েকখানা পত্র নলিনীকান্ত পেয়েছিলেন। আজ বেশ কয়েকদিন হলো তিনি কোন পত্র পান নি। এদিকে জমিদারি সেরেস্তার এত কাজের চাপ যে অন্য কিছু চিন্তা করবার সময় মেলে না। নিত্যই নলিনীকান্তকে রাত ন'টা দশটা পর্যন্ত কাজ করতে হয়।

সেদিন রাত আটটা হবে। নলিনীকান্তর দপ্তরের কাজ শেষ হয় নি। চারদিকে কাগজ-পত্তর ছড়ানো। যে দিকে তাকানো যায় সেদিকেই শুধু কাগজ। বড় টেবিলটার ওপর টেবিল-ল্যাম্পটা জ্বলছে। ঘরের ভিতর আর কেউ নেই। নলিনীকান্ত একপাশে একটা ইজিচেয়ারে শুয়ে আছেন। এত বড় জমিদারির তিনি সুপারভাইজার। যাঁর অধীনে চোদ্দ-পনেরো জন আমিন তাঁর দায়িত্ববোধ যে কত তা এই সময় নলিনীকান্তর শুকনো মুখখানার দিকে চাইলেই বোঝা যায়।

একটু তন্দ্রা এসেছে ক্লান্তিতে নলিনীকান্তের। এমন সময় হঠাৎ টেবিলের ওপর আলোটা কেন জানি নিষ্প্রভ হয়ে গেলো। অকস্মাৎ তাঁর তন্দ্রা যেন

ছুটে যায়। এ সময়ে ঘরে কে এলো! আশপাশে তাকিয়ে কিছু দেখতে না পেয়ে সামনে তাকিয়ে দেখেন তাঁর স্ত্রী সুধাংশুবালা টেবিলটা ধরে দাঁড়িয়ে আছেন।

তিনি ভয়ে চিৎকার করে উঠলেন।

কিন্তু এ অসম্ভব সম্ভব হবে কি করে! তিন মাস আগে যাকে তিনি নিজে রেখে এসেছেন বাড়িতে হঠাৎ তার পক্ষে এখানে আসা কিছুতেই সম্ভব নয়।

ছায়ামূর্তি তেমনি ধীর স্থির ভাবে দাঁড়িয়ে রয়েছে, মুখখানা কি করুণ, কত বেদনার রঙ তাতে মাখানো। তিনি বুঝতে পারলেন তাঁর স্ত্রী বেঁচে নেই। এ তার অশরীরী মূর্তি। নলিনীকান্ত এবার যেন ভয় পেয়ে গেলেন। সমস্ত শরীরটা যেন একবার কেঁপে উঠলো। চিৎকার করে উঠলেন: তুমি কে? কথা বলো।

নলিনীকান্তের চিৎকারে আশপাশ থেকে সবাই ছুটে এলো। সবাই এসে ভালো ভাবে চারদিকে সন্ধান করে বেড়ালো কিন্তু কোথাও সে ছায়ামূর্তি আর দেখতে পেলো না। অনেক আগেই সে মূর্তি অদৃশ্য হয়ে গেছে।

নলিনীকান্ত কেমন যেন হয়ে গেলেন। তাঁর চিন্তা কোন্‌দিকে ধাবিত হচ্ছে তাই বা কে জানে। আর মাত্র ২০।২১ দিন বাদেই দুর্গাপূজা। তিনি একেবারে তখন পূজোর ছুটির সঙ্গে আরও কিছুদিন ছুটি নিয়ে পূজো কাটিয়ে আসবেন ঠিক করে রেখেছেন। আজ হঠাৎ এ দৃশ্যের অবতারণা কেন হলো? তিনি একবার ভাবলেন সুধাংশুবালা ইহজগতে নেই, আবার ভাবলেন, এ তাঁর মনের ভ্রমও হতে পারে।

একবার তিনি ভাবলেন কালই দেশের পথে রওনা হবেন। কিন্তু এত বড় দায়িত্ব তাঁর ঘাড়ে দিয়ে যাঁরা অগাধ বিশ্বাসে নিশ্চিন্ত হয়ে বসে আছেন, এখন সব ছেড়ে গেলে তাঁদের বিশ্বাসের মুখেই কুঠারাঘাত করা হবে। তার চেয়ে বরং পূজোর সময়ই তিনি যাবেন।

ছোটবেলা থেকেই নলিনীকান্তর পরকালের ওপর কোন আস্থা নেই। পরকাল বলে এ দুনিয়ায় কিছু নেই। দেহের সঙ্গেই সব কিছুর শেষ। জন্ম আর মৃত্যুই এই দুই সত্য। এ জগতে এর ওপর আর কিছু আছে এ তিনি বিশ্বাস করেন না। মানুষের মৃত্যুর সাথে সব কিছুরই মৃত্যু হয়। পুনর্জন্ম, আত্মা এ সব অলীক।

নলিনীকান্তর ছায়ামূর্তি দর্শন করবার পর মন ভয়ানক উতলা হলো। দু'তিন দিন পর তিনি বাড়ি থেকে পত্র পেলেন যে তাঁর স্ত্রীর ভয়ানক অসুখ।

পত্র পেয়ে এবার তাঁর মন অত্যন্ত অস্থির হয়ে পড়লো।

সুধাংশুবালাকে নলিনীকান্ত জীবনের চেয়েও বেশী ভালোবাসতেন। সেই প্রিয়তমা স্ত্রীর যদি সত্য-সত্যই জীবনান্ত হয়ে থাকে—একথা তিনি কল্পনাও করতে পারছেন না। এমনও হতে পারে যে মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে তাঁকে দেখা দিয়ে মিলিয়ে গেলো। এই যদি সত্যই হয় তাহলে পরলোক বা পরকাল বলে নিশ্চয়ই কিছু আছে।

মনের ভিতর নানান চিন্তার-ঝড়ে সব তোলপাড় হতে লাগলো। পরলোক কোথায়? পরকাল কি? মানুষের মৃত্যু হলে তার আত্মার কি গতি হয়? এই সব চিন্তা তাঁর মনের মধ্যে ঢেউ তুলতে লাগলো।

তার চেয়ে তিনি দেশে না যাওয়াই স্থির করলেন। সামনা সামনি কেউ এসে তো তাঁকে সংবাদ দেয় নি। তিনিও আর দেশে কোন পত্র দেবেন না। তাহলে তাঁর মন বুঝবে যে সুধাংশুবালার অসুখ হয়েছিল ঠিকই কিন্তু এখন সে সুস্থ হয়েছে।

নলিনীকান্ত তেমনি ভাবেই কাজ করে যান। এত বড় দুঃসংবাদের পরও যে কোন লোক এইভাবে নিবিষ্টমনে কাজ করতে পারে তা ধারণাই করা যায় না।

যে টেবিলটার এক পাশে সুধাংশুবালার ছায়ামূর্তির প্রকাশ হয়েছিল সেই টেবিলের ওপর রোজই টেবিল-ল্যাম্পটা জ্বলে। কাগজ-পত্তর তেমনি ভাবে চারদিকে ছিটানো থাকে। নলিনীকান্তও তেমনি ভাবে বসে কাজ করেন আর মাঝে মাঝে হয়তো ভাবেন, সুধাংশুবালাকে আবার হয়তো দেখা যাবে। কিন্তু অপেক্ষা করে করে শুধু রাতই বাড়ে, দেখা আর মেলে না।

নলিনীকান্ত ভাবেন, সুধাংশুবালার যদি সত্যি-সত্যিই মৃত্যু হয়ে থাকে তাহলে ঐ মূর্তিটা কে? দেহ তো শেষ হয়ে গেলো। তবে কি আত্মা? আত্মা মৃত্যুর পর কি এমনি ভাবে ঘুরে বেড়ায়? তার কি মৃত্যু নেই?

ও পাশের জানালা দিয়ে কার যেন গীতাপাঠের সুর ভেসে আসছে—

"ন জায়তে ম্রিয়তে বা কদাচিৎ
নায়ং ভূত্বা ভবিতা বা ন ভূয়ঃ।
অজো নিত্যঃ শাশ্বতোঽয়ং পুরাণো
ন হন্যতে হন্যমানে শরীরে

নলিনীকান্ত জানালার ধারে এগিয়ে এলেন। কান পেতে শুনতে লাগলেন—

"বাসাংসি জীর্ণানি যথা বিহায়
নবানি গৃহ্লাতি নরোঽপরাণি
তথা শরীরাণি বিহায় জীর্ণা-
ন্যন্যানি সংযাতি নবানি দেহী ॥
নৈনং ছিন্দন্তি শস্ত্রাণি নৈনং দহতি পাবকঃ।
ন চৈনং ক্লেদয়ন্ত্যাপো ন শোষয়তি মারুতঃ ॥
অচ্ছেদ্যোঽয়মদাহ্যোঽয়মক্লেদ্যোঽশোষ্য এব চ।
নিত্যঃ সর্বগতঃ স্থাণুরচলোঽয়ং সনাতনঃ ॥"

নলিনীকান্ত জানালার শিক ধরে দাঁড়িয়ে রইলেন কাষ্ঠপুত্তলীর মত। ভাবলেন—তবে! একথা যদি সত্য হয় তাহলে তো পরলোক সত্য, পুনর্জন্ম সত্য, আত্মা সত্য!

নলিনীকান্তর চোখ দুটো আজ এই রাতের অন্ধকারে জলে ভরে এলো। আপন মনে দু'চোখের কোণা বেয়ে জলের ধারা বুকে এসে পড়েছে। সুধাংশু-বালা কোথায় কত দূরে কে জানে—নলিনীকান্তর চোখের জল আজ তাকে খুঁজে তো পাচ্ছে না।

বাইরে কার যেন ডাক শোনা যায়: বাবু!

নলিনীকান্ত তাড়াতাড়ি চোখ মুছে বলেন: কে!

: আমি!

বৃদ্ধ আমিন এসে বলে: আজকের মত দপ্তর গুছিয়ে রেখে দিয়ে বাসায় যান বাবু।

: যাই।

: আমিই না হয় গুছিয়ে দি, আপনি বসে বসে দেখেন ঠিক হচ্ছে কি না।

বৃদ্ধ আমিন কাগজ-পত্র গোছাতে গোছাতে বলে: বাবু, দেশে গেলে ভালো করতেন।

: কেন!

: গিন্নীমার ঐরকম অসুখের সংবাদটা শুনে যাওয়াই উচিত ছিল। মানুষের কথা কি কিছু বলা যায়। এই আছে এই নেই। জলের ভুড়ভুড়ি।

: এখন কাজ অনেক, ভাবছি পুজোর সময় যাবো।

॥ ৬ ॥

শারদীয়া পূজার আর দেরি নেই। দিকে দিকে সাড়া পড়ে গেলো। নলিনীকান্ত কুতুবপুরের উদ্দেশ্যে রওনা হলেন। চুয়াডাঙা রেল স্টেশনে নেমে সোজা তিনি ঘাটে গিয়ে নদী পার হয়ে ওপারে গিয়ে দেখেন কুতুবপুরের এক চেনা গাড়োয়ান গাড়ি নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

নলিনীকান্ত গাড়ির কাছে গিয়ে বললেন : কুতুবপুর যাবে নাকি ?

: যাবো তো বাবু, কিন্তু এত দেরি করলেন কেন ?

নলিনীকান্ত চমকে গিয়ে বললেন : কেন, দেরিতে কি হয়েছে !

: কি আর হবে বাবু ? আজ ২০।২২ দিন হলো আপনার স্ত্রী স্বর্গে গেছেন।

তিনি আর দাঁড়াতে পারলেন না। সমস্ত দুনিয়া যেন এক লহমায় ঘুরে গেলো। গাড়ির ভিতর গিয়ে তিনি বসে পড়লেন।

গাড়ি চলতে শুরু করেছে।

নলিনীকান্ত গাড়ির ভিতর বসে ভাবছেন, আজ থেকে ২০।২২ দিন আগে সুধাংশুবালার ছায়ামূর্তি তিনি নারায়ণপুরের কাছারীতে দেখেছেন। তিনি চিন্তা করে বুঝলেন তিনি যে সময় ছায়ামূর্তি দেখেছেন তাঁর স্ত্রী কুতুবপুরে ঠিক তার দণ্ড-চারেক পূর্বে দেহত্যাগ করেছে।

দীর্ঘ ২৮ মাইল তাঁকে এখনও যেতে হবে ; তবে কুতুবপুরের সীমানা।

পরদিন বেলা সাড়ে আটটার সময় তিনি কুতুবপুরে পৌঁছালেন।

পথে অনেকের সাথেই তাঁর দেখা হলো কিন্তু তিনি কারও সাথে কোন কথা বললেন না। যারা তাঁকে দেখলো তারাও কেউ কিছু বললে না। নলিনীকান্তর ভিতর কোন চঞ্চলতা প্রকাশ পেলো না। ধীর পদবিক্ষেপে তিনি বাড়ির বাইরে বারান্দায় গিয়ে বসলেন।

কতজনের কত কথা তাঁর কানে আসছে, কিন্তু তাঁর যেন কিছুতেই ভ্রূক্ষেপ নেই। কেউ বললেন : সুন্দরী মেয়ের ভাবনা কি, এ বৌয়ের চেয়েও সর্বগুণসম্পন্না সুন্দরী মেয়ে আছে। নলিনীকান্ত একবার মুখ ফুটে শুধু বললেই হয়, তাহলে মেয়ের বাবা মেয়ে এনে ঘরে তুলে দিয়ে যাবে।

কেউ বা বললেন: ভগবান যা করেন মঙ্গলের জন্যই। ঐ বউ থাকলে নলিনীর কোন সুখ-শান্তি হতো না, তাই সময় থাকতেই সরিয়ে নিয়েছেন।

নলিনীকান্ত এ সব কথা শুনে অন্তরে বড় বেদনা অনুভব করলেন। ছিঃ ছিঃ! এই কি মানুষের পরিণাম! এই মানুষটা ২০।২২ দিন আগেও সংসারের গৃহলক্ষ্মী বলে অভিহিতা হতো। তার অঙ্গ স্পর্শে সমস্ত জিনিস সংসারে যেন নতুন রূপ ধারণ করতো। তার কথাবার্তা চালচলন সকলের কাছে কি সুন্দরই না মনে হতো। একদিন সে অন্যত্র গেলে সমস্ত বাড়ি ঘর যেন অন্ধকারাচ্ছন্ন মনে হতো। তাকে ঘিরে কত আশা সেদিন সকলের ছিল। আর আজ সে নেই! তাই সে আজ সকলের মঙ্গল করে গেছে। ভগবান তাকে গ্রহণ করে গোটা সংসারটার মঙ্গল করে গেছেন। আজ আবার একটা সুন্দরী বৌ ঘরে আনলে হয়তো আগের চাইতেও বেশী লাভবান হওয়া যাবে। এ বৌ হয়তো আগের বৌয়ের চাইতেও ছেলেকে বেশী ভালোবাসবে, যত্ন করবে। ব্যবসাদারী সমাজ ব্যবস্থা!

এ যেন মানুষ কেনা-বেচার হাট। এখানেও সেই লাভ লোকসান। এখানে স্নেহ প্রেম নেই। সুধাংশুবালাও একদিন এই হাটে বিক্রি হয়েছিল—যে ক্রেতা, তার কাছ থেকে সেদিনের সওদা করা সুধাংশুবালা হারিয়ে গেছে।

তাই আজ আবার নতুন সওদার কথাবার্তা চলছে। এই বুঝি পৃথিবী! বেচা আর কেনা। কেনা আর বেচা। মাঝখানে সব ফাঁক আর ফাঁকী। নলিনীকান্ত বিরক্ত হয়ে ওঠেন—এরা কি মানুষের মনের খবর রাখে না!

সেদিন সপ্তমী তিথি।

মহামায়ার পূজার আরতির বাজনা বাজছে। আকাশে সপ্তমী তিথির চাঁদ যেন নলিনীকান্তর দিকে একদৃষ্টে চেয়ে আছে। তাঁর সমস্ত বুক যেন ভেঙে গুঁড়োগুঁড়ো হয়ে যাচ্ছে।

ধীরে ধীরে নিজের ঘরে ঢুকে নলিনীকান্ত বিছানার ওপর বসে চারদিক চান। সবই তো আছে, শুধু সেই নেই। ঐ তো তার সিঁদুরের কৌটা, ঐ তো তার লালপাড় শাড়িটা, ঐ তো তার লক্ষ্মীর পট।

শুধু সেই নেই।

ঘর বাড়ি, বাক্স, গয়না, বাগান, পুকুর, জমি-জমা সবই তো মানুষ করে।

তারপর একদিন সবই পড়ে থাকে, মানুষ চলে যায়। মৃত্যুর পর কি সবই শেষ হয়ে যায়, না কিছু থাকে? এ কথার জবাব তো নলিনীকান্ত কারও কাছে পান না!

নলিনীকান্তর চোখ দুটো শুধু বার বার জলে ভরে আসে।

মৃত্যুতে সব যদি শেষ হয়ে যায় তাহলে এ চোখের জল কোথা থেকে আসে? এ চোখের জল ঝরছে কার জন্য? তার দেহের জন্য না আত্মার জন্য?

হঠাৎ তাঁর চিন্তা-সূত্র যেন ছিন্ন-ভিন্ন হয়ে যায়। মলের বাজনা কোথা থেকে আসে! মল পায়ে দিয়ে ঘরের ভিতর কে বেড়াচ্ছে যেন! সুধাংশুবালার পায়ে একটা মল ছিল, সে মলেরও তো এমনি ধারা শব্দ হতো। মনে হচ্ছে কে যেন তাঁর পাশে এসে দাঁড়িয়েছে। মলের শব্দ আর তো শোনা যায় না। আর কিছু বুঝতে না পেরে তিনি বাইরে চলে এলেন।

ভুবনমোহন পুত্রবধূ হারানোর পর প্রায় পাগলের মত হয়ে গেছেন। সময়মত খাওয়া নেই—এলোমেলো ভাবে ঘুরে বেড়ান।

নলিনীকান্ত বাবার কাছে আসেন।

ভুবনমোহন তাঁকে জড়িয়ে ধরে কাঁদতে লাগলেন বালকের মত। ভুবনমোহন যত কাঁদেন, নলিনীকান্তও তত কাঁদেন।

একটু শান্ত হলে ভুবনমোহন বলেন: বাবা, দিনরাত শুধু চোখ বুজে থাকতো, শুধু তোর কথা বললেই চোখ মেলতো।

নলিনীকান্ত কোন কথা বলেন না। সমস্ত কথারই বুঝি শেষ হয়ে গেছে।

দেখতে দেখতে দুর্গাপূজা শেষ হয়ে গেলো।

নলিনীকান্ত গ্রামের পথে ঘুরে বেড়ান। স্ত্রীর কথা এক একবার ভাবেন; সে সব ভুলে যেতেই হবে। তা না হলে দিনরাত বৃশ্চিক দংশনে তাঁকে দগ্ধ হতে হবে! চেষ্টা করতে লাগলেন কি ভাবে স্ত্রীর স্মৃতি চিরতরে ভুলে যাওয়া যায়।

"নলিনীকান্তের এক কাকীমা তাঁকে নির্জনে পেয়ে বললেন: তিন-দিনের জ্বরে বৌমা নিস্তব্ধ হয়ে গেলো। তোর নাম শুনলেই সে সাড়া দিতো। তিনদিনের জ্বরে সব শেষ। তোর নাম বলতেই সে চোখ মেলে চেয়েছে। তোকে বিবাহ কোরতেও নিষেধ করে গেছে।"

—শ্রীশ্রী নিগমানন্দ স্মৃতি

সেদিন বোধ হয় দ্বাদশী হবে।

দেবী-পূজান্তে সমস্ত গ্রাম যেন বিষাদে ভরে গেছে। নলিনীকান্ত একা একা বনের পথটা দিয়ে বাড়ির দিকে আসছিলেন। হঠাৎ আসতে আসতে তিনি একটা গাছের তলায় এসে থমকে দাঁড়ালেন।

সুধাংশুবালার ছায়ামূর্তি দাঁড়িয়ে আছে!

তাঁর সমস্ত শরীর আজ শিউরে উঠলো। তিনি তাড়াতাড়ি বাড়ি চলে এসে মনে মনে ঠিক করলেন আর এখানে থাকা হবে না। পরদিনই দিনাজপুর চলে যাবার ব্যবস্থা করতে লাগলেন।

পরলোক আছে ঠিকই! এ বিষয়ে তাঁকে রহস্য উদ্‌ঘাটন করতে হবে। পরলোক সম্বন্ধে যাঁদের জ্ঞান আছে তাঁদের সঙ্গে দেখা করে এর মীমাংসা করতেই হবে!

বার বার কেন এসে সে দেখা দিচ্ছে। কি তার মনের কথা তাঁকে তা জানতেই হবে। মৃত্যুর পর ছায়ামূর্তি হয়ে বার বার দেখা দিতে হবে জেনে তার মৃত্যুই বা কেন হলো? এ অলৌকিক জগতে যাবার পথ কথায়? এ পথের সন্ধান কে তাঁকে দেবে!

নলিনীকান্ত চিন্তাতুর মন নিয়ে দিনাজপুর চলে এলেন।

অবসর সময়ে তিনি সাধু-সন্ন্যাসীর সন্ধান নেন। এবার এসে তিনি সম্পূর্ণ ভাবে কাজের ভিতর ডুবে থাকার চেষ্টা করতে লাগলেন।

এই সময়ে আবার একদিন রাতে তিনি সুধাংশুবালাকে পরিষ্কার জীবন্ত মূর্তির মত দেখলেন। তাঁর মনে হলো এ মূর্তি যেন তাঁর সাথে সাথেই রয়েছে। এ অশরীরী মূর্তি তাঁর পেছন পেছন কেন ঘুরছে? কি চায় সে! তাঁর কোন ক্ষতি করবার বাসনা মনে নেই তো? কে জানে—

লোকে বলে, মানুষ মৃত্যুর পর শত্রু হয়! যে কোন ক্ষতি করতেও সে পিছ-পা হয় না।

তবে কি সুধাংশুবালা তাঁর কোন ক্ষতি করবার মতলবে ঘুরছে? তাই বা কি করে সম্ভব! একদিন যার বক্ষে তার স্থান ছিল আজ সে কোন্ আক্রোশে তার ক্ষতি করতে উদ্যত হবে!

কে জানে! কে বলবে!

এ প্রশ্নের জবাব তাঁকে পেতেই হবে।

॥ ৭ ॥

দিনাজপুর থেকে বদলি হলেন খুলনা জেলার কুমিরাতে। এখানে কাজে যোগ দিয়ে তিনি ক'দিন ছুটি নিয়ে কলকাতা এসে যাঁরা প্রেততত্ত্ব, পরলোকতত্ত্ব নিয়ে আলোচনা করেন বা এই নিয়ে যাঁরা দিবারাত্র চর্চা করেন, তাঁদের সঙ্গে যোগাযোগ করে জানতে পারলেন যে, এ বিষয়ে ভালোভাবে জানতে গেলে মাদ্রাজের এ্যাদেয়ারে (Adyar) যেতে হবে। তিনি দেরি না করে তার পরদিনই মাদ্রাজ রওনা হলেন।

তাঁর মনে আর কোন চিন্তা নেই। এত বড় জগতে যে কত কি জানবার আছে তাতে তাঁর কোন ভ্রুক্ষেপ নেই—শুধু একই চিন্তাতে তিনি বিভোর। প্রিয়তমা স্ত্রীর সাথে তাঁকে মিলতেই হবে। তার কাছে জানতে হবে এখন কোথায় সে কি ভাবে রয়েছে।

এ্যাদেয়ারে সোসাইটির প্রধান হচ্ছেন রেভারেণ্ড লেড্‌বিটার। তাঁর কাছে নলিনীকান্ত মৃতাত্মার সাথে যোগাযোগ সম্বন্ধে অনেক কিছু জানতে পারেন। সুধাংশুবালার মৃত আত্মাকে এনে তাকে অনেক প্রশ্নও করলেন; জবাবও অনেক পেলেন। প্রেতাত্মা সম্বন্ধে অনেক বইও তিনি পড়ে ফেললেন। কিন্তু মন তাঁর ভরলো না।

তিনি ফিরে এলেন আবার কর্মস্থল কুমিরায়।

চাকা যেমন ঘোরে, চরকি যেমন ঘোরে, তেমনি ভাবে নলিনীকান্ত ঘুরে বেড়াচ্ছেন। এ সময় তাঁর মনের অবস্থা এমনই যে সারা পৃথিবী তিনি ঘুরে বেড়াতেও দ্বিধা করবেন না, যদি প্রকৃত তথ্যের সন্ধান পান।

জীবন আর মৃত্যু।

মৃত্যু আর জীবন।

এ দুয়ের কোন্‌টা সত্য?

জীবন যদি সত্য হয় তাহলে মৃত্যু কি মিথ্যা?

মৃত্যু যদি সত্য হয় তাহলে জীবন কি মিথ্যা?

জীবন তো শুধু জীবন নয়, জীবন একটা নানান রকম অভিজ্ঞতার খনি। এর উত্থান আছে, পতন আছে; শিক্ষা আছে দীক্ষা আছে; জীবন শাশ্বত

ঈশ্বর-জ্ঞানের পথ। জীবনই তো ঈশ্বর, জীবনধ্যানই তো ঈশ্বরধ্যান। জীবন-চর্চাই তো ঈশ্বরচর্যা। জীবন-সেবাই তো ঈশ্বর-সেবা। জীবনই মহাজ্ঞানের সরোবর। এক একটা জীবন এক একটা মূর্তিমান বিগ্রহ।

এ জীবন যখন অনাদরে ধূলায় লুণ্ঠিত হয়, এ জীবন যখন অবহেলায় লাঞ্ছিত হয়, তখনই হয় মৃত্যু।

সবাই যখন তাকে দূরে ঠেলে দেয়, মৃত্যুই তখন তার শীতল পরশে কাছে টেনে নেয়। মৃত্যু সে জীবনকে করে তোলে মহীয়ান। এই মৃত্যুকে সবলে আনার সাধনাই ঈশ্বর-সাধনা। ভারতবর্ষের মহান সাধকরা এই সাধনাতেই মৃত্যুকে ঘুরিয়ে নিয়ে বেড়িয়েছেন আবার ইচ্ছা মতই তার কোলে আশ্রয় নিয়েছেন; এ শক্তি কোথায় তাঁরা পেলেন? আত্মশক্তিতে অগাধ বিশ্বাস ছিল তাঁদের। সে শক্তি তো ঈশ্বরের শক্তি।

জীবন ও মৃত্যু দুই-ই পরম সত্য।

একই মানুষের দুই মূর্তি। জীবন মৃত্যু।

নলিনীকান্তের চিন্তার স্রোত প্রবল বেগে বয়ে চলেছে। এ স্রোতে যেন সব ভেসে চলেছে। মনের ভিতর যখন চিন্তার স্রোত দেহ-মনের সমস্ত কূল-কিনারা ভেঙ্গে চলেছে তখন একদিন সংবাদ পেলেন যে কলকাতায় একজন বড় সাধু এসেছেন। নাম স্বামী পূর্ণানন্দ পরমহংস। এঁর পূর্বনাম পূর্ণচন্দ্র দত্ত। ইনি ডাফ কলেজের একজন বিজ্ঞানের অধ্যাপক ছিলেন। তিনি সংসার ত্যাগ করে সন্ন্যাসী হয়ে বিন্ধ্যাচলে আশ্রম স্থাপন করেন ও তন্ত্রসাধনায় সিদ্ধিলাভ করেন।

নলিনীকান্ত যেন অকূলে কূল পেলেন। কোথায় নোঙর করতে হবে তা তিনি খুঁজে এতদিন পাচ্ছিলেন না, এবার তিনি বুঝি আশ্রয় পেলেন।

ব্যাকুল হয়ে তিনি ছুটে এলেন কলকাতায়।

স্বামী পূর্ণানন্দ বসে আছেন একটা আসনে—চারদিকে সবাই তাঁকে ঘিরে আছে। নলিনীকান্তও একপাশে চুপ করে বসে আছেন। যে আসছে সেই তাঁকে প্রণাম করছে কিন্তু নলিনীকান্ত নিজে ব্রাহ্মণ হয়ে কি করে শূদ্রের পদধূলি গ্রহণ করেন! এ কাজটা তাঁর মনঃপূত না হওয়ায় তিনি প্রণাম করা থেকে বিরত থেকে কে কি বলেন তাই শুনতে লাগলেন।

কেউ বলছেন, ঈশ্বর দর্শন কি ভাবে হয়? কেউ বলছেন, জ্ঞান লাভ কি

করে হয়? কেউ বা বলছেন প্রকৃত শান্তি কি ভাবে পাওয়া যায়? আবার কেউ বা বলছেন, শোক তাপ ভুলে কি করে থাকা যায়?

কত রকমের প্রশ্ন! স্বামী পূর্ণানন্দ সহজভাবে সবাইকে জবাব দিচ্ছেন। কিন্তু তাঁর প্রশ্ন তো এ ধরনের নয়! নেহাৎ সাধারণ ছোট একটা প্রশ্ন। হয়তো লজ্জাকর, হয়তো হাস্তকর। কিন্তু তবুও তাঁকে জানতে হবে স্বামীজীর মত।

একবার ভাবেন ইনি যদি শক্তিমান সাধক হন তাহলে নিশ্চয়ই তাঁকে ডেকে নিজে থেকেই তাঁর মনের কথার জবাব দেবেন।

তিনি অন্য সকলের সাথে বসে থাকলেন। কিন্তু স্বামীজীর সঙ্গে কথা বলার কোন সুযোগই করে উঠতে পারলেন না।

তারপর সবাই যখন উঠে গেলো তিনিও উঠে চলে গেলেন।

পরদিন আবার সবার সাথে গিয়ে একপাশে বসলেন।

অপূর্ব চেহারা স্বামী পূর্ণানন্দের। সারা মুখমণ্ডলে বিচিত্র এক জ্যোতি যেন প্রকাশ পাচ্ছে।

তিনি দু'চারটে কথা বলার পর সবাইকে বললেন: আজ আমি বেশীক্ষণ সকলের সান্নিধ্যে থাকতে পারবো না, কারণ আমার একটু অন্য কাজ আছে।

একথা বলার পড় সবাই তাঁকে প্রণাম করে উঠে পড়লেন। নলিনীকান্তও ব্যথিত মনে সবার সাথে উঠে দাঁড়ালেন।

স্বামী পূর্ণানন্দ তাঁকে ইশারা করে বসতে বললেন।

নলিনীকান্ত এবার তাঁর কাছে এসে বসে পড়লেন। স্বামীজী তাঁর দিকে চেয়ে একটু হেসে বললেন: তুমি তো আমার কাছাকাছিই থাকো। এসো, আরও কাছে এসো। তোমার সঙ্গে আমার কথা আছে।

নলিনীকান্ত মনে মনে ভাবলেন, ইনি নিশ্চয়ই মহাপুরুষ। তা না হলে কি করে জানলেন যে কাছাকাছিই আমি থাকি।

স্বামীজী বললেন: এবার বলো তোমার কি বক্তব্য।

নলিনীকান্ত ইতস্ততঃ করছেন দেখে স্বামীজী বললেন: বলো, লজ্জা কি?

নলিনীকান্ত মুখটা একটু নীচু করে বললেন: দেখুন, আমি ঈশ্বরতত্ত্ব সম্বন্ধে কিছু জানতে আসি নি। ঈশ্বর সম্বন্ধে আমার তেমন কোন কৌতূহল নেই; আর আমি ঠিক মনে-প্রাণে ঈশ্বরকে মানি না। ঈশ্বর আমার কাম্য বস্তু নয় বা তাঁর জন্ত আমার কিছু মাত্র ব্যাকুলতা নেই।

: ভালো কথা! তোমার স্পষ্টবাদিতায় আমি মুগ্ধ হয়েছি। সবাই কি আর ঈশ্বর চায়? এই একটা জিনিসেই মানুষের বিশেষ কোন রুচি নেই। সবাই চায় ধন, ঐশ্বর্য, রূপ, যৌবন। এইগুলো পেলেই তো সব পাওয়া হয়ে গেলো।

নলিনীকান্ত বললেন: না, এর কোনটাই আমি চাই না। যারা এ পৃথিবীতে ব্যবসা করে লাভবান হতে এসেছে, এগুলো তাদেরই জন্য।

স্বামীজী চমকে যান। তবে এ কি চায়? মানুষের পৃথিবীতে এইগুলোই তো প্রয়োজন। এ তবে কি চায়!

নলিনীকান্ত এবার বললেন: আমি পরলোক বা পুনর্জন্ম বিশ্বাস করি না। আমার স্ত্রী মারা যাবার পর কয়েকবার তার ছায়ামূর্তি দেখেছি। এ সব দেখে আমার মনে একটু সন্দেহ জেগেছে। জন্মের মত যে আমাকে ছেড়ে গেলো আবার সে কোথা থেকে আসছে? কেনই বা আসছে? এ সব জানবার জন্য বহু বই পড়েছি। পরলোকতত্ত্ববেত্তাদের শরণাপন্ন হয়েছি। এমন কি ভারতবর্ষে সবচেয়ে বেশী যেখানে পরলোকতত্ত্ব সম্বন্ধে চর্চা হয় সেই মাদ্রাজ পর্যন্ত ছুটে গিয়েছি, কিন্তু আমি সন্তুষ্ট হতে পারি নি। আমি আমার মৃত স্ত্রীর সাথে মিলতে চাই, তার সঙ্গে কথা বলতে চাই। এ সম্বন্ধে আমাকে যদি কিছু আলোকপাত করতে পারেন তাহলে আমি শান্তি পাই।

পূর্ণানন্দ বললেন: দেখ, এ বিষয়ে আমি তোমাকে এখনই কিছু বলতে পারবো না। তুমি কাল দুপুরের সময় সোজা চলে এসো আমার কাছে, তখন তোমাকে যা বলবার বলবো।

নলিনীকান্ত উঠে দাঁড়ালেন। প্রণাম করবেন কি না ভাবছেন। এমন সময় স্বামীজী বললেন: সব সময় সবার কাছে মাথা নোয়ানো যায় না। সেটা করাও ঠিক নয়। মন হচ্ছে ঈশ্বরের প্রতিনিধি। সেই মনের নির্দেশ প্রত্যেকেরই পালন করা উচিত। তুমি যাও, কাল দুপুরে এসো।

নলিনীকান্ত লজ্জায় যেন নুয়ে পড়লেন।

মন শুধু ঈশ্বরের প্রতিনিধি নয়—ঈশ্বরেরই অংশ।

নলিনীকান্ত আজ বেশ প্রসন্ন মনেই ফিরে এলেন। এবার স্বামীজীর কৃপায় তাঁর সব কিছুর নিশ্চয়ই সমাধান হবে। রাত্রি কখন শেষ হবে সেই লগ্নক্ষণই শুধু তিনি চিন্তা করতে লাগলেন।

সুধাংশুবালাকে তিনি হারিয়েছেন আজ কয়েক মাস। মনে হয় যেন

দেখতে দেখতে কয়েকটা যুগ কেটে গেছে। গত বছরও এমনি সময়ে সে ছিল, আর আজ সে কত দূরে।

নলিনীকান্ত জানালার ধারে এসে দাঁড়ালেন।

এটা শহর কলকাতা, চারদিকে মানুষের শুধু কলরব আর আলোর রোশনাই। আনন্দময় পৃথিবীতে সবাই আনন্দে মত্ত, আর সে চির অন্ধকারময় এক গহনপথের যাত্রী।

সবই তো আছে শুধু সুধাংশুবালাই নেই।

ঈশ্বর কি নির্দয় নির্মম! কি ভীষণ! সব পূর্ণ আছে শুধু তাকেই তিনি শূন্য করে দিলেন। কি তার অপরাধ—শূন্য জীবনে ঈশ্বরের অস্তিত্ব থাকা সম্ভব নয়। তাই নলিনীকান্ত ঈশ্বর সম্বন্ধে কঠিন কঠোর।

পরদিন দুপুরবেলায় নলিনীকান্ত পূর্ণানন্দের কাছে গেলেন।

তিনি যেন তাঁরই জন্য অপেক্ষা করছিলেন, বললেন: এসো, তোমারই জন্য পথ চেয়ে বসে আছি।

নলিনীকান্ত হাতজোড় করে বললেন: আপনার অশেষ কৃপা।

পূর্ণানন্দ বললেন: দেখ, তোমার স্ত্রীকে পাবার কোন সাধনা আমার জানা নেই। তবে আমার মনে হয় তুমি যদি জীবপালিনী জগজ্জননী আদ্যাশক্তি মহামায়ার আরাধনা করতে পারো তাহলে সব কিছু লাভ হবে। তোমার স্ত্রীও ঐ আদ্যাশক্তির অংশ। সেই আদ্যাশক্তির সাধন-ভজন করে যদি তাঁর সাক্ষাৎলাভ করতে পারো তাহলে তুমি তোমার স্ত্রীকে ফিরে পাবে। এই সাধনায় যদি সফলকাম হতে পারো তাহলে তুমি সবই কিছু পারবে। স্ত্রীকেও পাবে; জগন্মাতা মহামায়াকেও জানতে পারবে।

নলিনীকান্ত মুখটা নীচু করে বললেন: আদ্যাশক্তির সাধনা করে যদি কোনরকমে আমার স্ত্রীকে ফিরে পাই তাহলে জগজ্জননীর আমার দরকার হবে না। একটু চুপ করে থেকে বললেন: আপনি সাধন প্রণালী আমায় বলে দিন, আমি কাজ শুরু করে দি।

: কিন্তু তার জন্য তো দীক্ষা নিতে হবে!

: তবে আমায় দীক্ষা দিন।

: আমি তো তোমাকে দীক্ষা দিতে পারবো না, আমি তোমার গুরু নয়। তোমার গুরু নির্দিষ্ট আছেন, সময়মত তুমি তাঁর দেখা পাবে।

: বড় বিপদে ফেললেন, কোথায় আমি গুরু খুঁজে বেড়াবো? কবে আমি গুরু দর্শন করবো, দীক্ষা নেবো, তারপর আমার সাধনা শুরু হবে!

পূর্ণানন্দ একটু হেসে বললেন: তুমি তোমার স্ত্রীকে পাবার জন্য বড্ড বেশী ব্যস্ত হয়ে পড়েছো।

নলিনীকান্ত এবার লজ্জা পেলেন।

পূর্ণানন্দ আবার বললেন: আচ্ছা, তুমি বড় বেশী ভালোবাসতে তোমার স্ত্রীকে, তাই না?

নলিনীকান্ত মুখ নীচু করেই থাকেন, কোন জবাব দেন না।

: আচ্ছা, একটা কথার জবাব দাও তো।

: বলুন!

: ঠিক এই মুহূর্তে তোমার স্ত্রী যদি তোমার কাছে আসেন তুমি তাহলে কি করবে?

: আমি তাকে বুকে টেনে নেবো।

পূর্ণানন্দ হাসলেন: তা তুমি পারবে না, আমি নিশ্চিত জানি। তুমি কি করবে জানো, তুমি ভয়ে ছুটে পালাবে।

: পালাবো!

: হ্যাঁ নলিনীকান্ত, তুমি ঠিক তাই করবে!

এবার পূর্ণানন্দ একটু গম্ভীর হলেন।

দুটো চোখ তাঁর বন্ধ হয়ে যায়। তিনি যেন আর এ জগতে নেই। নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস যেন হঠাৎ থেমে যায়। এ তাঁর কি ভাব?

নলিনীকান্ত কিছু বুঝতে না পেরে বলে ওঠেন: স্বামীজী!

ভাবগম্ভীর কণ্ঠে তিনি বললেন: যে চলে গেছে তাকে যেতে দাও, পিছু ডেকো না। তুমি তো জানো না তার কি কষ্ট!

: কষ্ট! কেন—

: তুমি তাকে পিছু টানছো বলে তার কষ্টের শেষ নেই। তাকে তোমার ফিরে পাবার চিন্তা, তার জন্য তোমার মনোবেদনা তার পক্ষে ক্ষতিকরই হচ্ছে। যদি সত্যিই তুমি তাকে ভালোবেসে থাকো তাহলে তুমি তাকে আনন্দে পথ চলতে দাও।

নলিনীকান্ত উঠে দাঁড়ালেন।

স্বামী পূর্ণানন্দ বললেন: তুমি সফলকাম হও এই আশীর্বাদই করছি।

নলিনীকান্ত ধীরে ধীরে উঠে ঘর থেকে বেরিয়ে পথে এসে নামেন।

ভাবতে ভাবতে চলেন তিনি—জগজ্জননীর সাধনা তাঁকে করতেই হবে। যেমন করে হোক আদ্যাশক্তি মহামায়ার সাক্ষাৎলাভ তাঁর চাইই।

কিন্তু সুধাংশুবালা!

তার কথা তিনি কি করে ভুলবেন! জীবনের অণু-পরমাণুতে যে সে ঘর বেঁধেছিল। নিজেকে শূন্য করে তাঁকে সে পূর্ণ করেছিল, আর আজ এক নিমিষেই তাকে ভুলে যাবেন কি করে!

এবার মনে মনে তিনি একটু আশান্বিত হলেন এই ভেবে যে, সুধাংশুবালার দেখা তিনি নিশ্চয়ই পাবেন। কিন্তু গুরুর সন্ধান তিনি কি ভাবে পাবেন? তিনি তো তাঁকে চেনেনও না, কোনদিন দেখেনও নি। তবে কি ভাবে তাঁর যোগাযোগ হবে?

॥ ৮ ॥

রাত্রে বেশ প্রফুল্ল মনেই তিনি শুয়ে পড়লেন। শুয়ে শুয়ে ভাবতে লাগলেন আদ্যাশক্তি মহামায়ার আরাধনা কি ভাবে তিনি করবেন। তাঁকে আরাধনা করার মন্ত্র-তন্ত্র কিছুই জানেন না। তবে কি 'মা' 'মা' বলে ডাকলেই মাতৃ-আরাধনা হবে? এতেই কি জগজ্জননী সন্তুষ্ট হবেন?

তিনি চিন্তা করতে করতে ঘুমিয়ে পড়েছেন। হঠাৎ গভীর রাতে তাঁর ঘুম ভেঙে গেলো। দেখলেন সারা ঘর আলোয় আলোময় হয়ে গেছে। হঠাৎ দেখতে পেলেন দীর্ঘ জটা মাথায়, পরনে গাছের বল্কল, সারা মুখে চন্দ্রমা-শোভিত এক সাধু।

নলিনীকান্ত শয্যার ওপর উঠে বসেছেন।

সাধু বললেন: বৎস, দীক্ষা নাও। ধর, এই তো তোমার আদ্যাশক্তি মহামায়ার সাধন-মন্ত্র।

নলিনীকান্ত যন্ত্রচালিতের মত হাত পেতে রইলেন।

সাধু তাঁর হাতের ওপর একটা কি যেন দিলেন।

তিনি প্রদীপ জেলে দেখলেন একটা বড় বিল্বপত্রের ওপর চন্দনে লেখা একটা মন্ত্র। কিন্তু এ মন্ত্র কি করে জপ করতে হবে তা তো তিনি বললেন না!

পেছন ফিরে দেখলেন সাধু অদৃশ্য হয়ে গেছেন। সারা মন তাঁর দুঃখে ভারাক্রান্ত হলো। তিনি পেয়েও যেন হারালেন এক মহামূল্য জিনিস।

চারদিকে চেয়ে দেখেন ঘরের দরজা জানালা সব বন্ধ। তিনি কোন্ পথে আবির্ভূতই বা হলেন আর কোন্ পথেই বা অন্তর্হিত হলেন, কিছুই বুঝতে না পেরে দরজা খুলে বাইরে এসে চারদিকে খুঁজলেন, কিন্তু কোথাও সাধুকে খুঁজে পেলেন না।

মানুষ স্বপ্ন দেখে—

কিন্তু এ ত স্বপ্ন নয়। স্বপ্নে বেলপাতাই বা এলো কি করে? তিনি যদি সাধুর চরণ প্রান্তে পড়ে তাঁকে ধরে রাখতেন তাহলে তাঁকে আর এ অনুশোচনা করতে হতো না।

তারপর তিনি মহাপণ্ডিত বা সাধু যেখানে পান তাঁকে জিজ্ঞাসা করেন এই দৈব ঘটনার কথা। কিন্তু কেউ কোন সদুত্তর দিতে পারেন না। যে কোনখানেই কোন সাধু মহাত্মার আসার কথা শুনলেই তিনি সেখানেই ছুটে যান, কিন্তু ঐ মন্ত্র সম্বন্ধে কেউ কোন রহস্য উদ্‌ঘাটন করতে পারেন না।

ঘুরে ঘুরে তিনি ক্লান্ত হয়ে বড় নিরাশ হয়ে পড়েন। ভেবে ভেবে কোন কিছু ঠিক করতে না পেরে অবশেষে কাশী যাওয়াই ঠিক করেন। কাশীতে ভারতবর্ষের বড় বড় সাধু মহাত্মার আনাগোনা। সেখানে গিয়ে তিনি একবার শেষ চেষ্টা করে দেখবেন।

তিনি কাশী চলে গেলেন চাকরি স্থলে একটা দরখাস্ত দিয়ে। তাঁর জীবন যদি এইভাবে ব্যর্থতায় ভরে যায় তাহলে চাকরি দিয়ে আর কি হবে। কাশীতে গঙ্গার ধার দিয়ে তিনি দিনরাত উন্মাদের মত ঘুরে বেড়ান। কত মানুষ, কত রকমের, কিন্তু কেউ তাঁর সঙ্গে কথাও বলে না। তাঁর মনের ব্যথার ভাগীদারও কেউ হয় না।

সারা দেহ-মন তার ভেঙ্গে যেন টুকরো টুকরো হয়ে যায়। জীবনের প্রতি তাঁর যেন এক পরম বিতৃষ্ণা জেগেছে। যে জীবন এ বিশ্ব-ভুবনের কোন কাজে এলো না সে জীবনের মূল্য'কি! মানবজন্ম শ্রেষ্ঠ জন্ম। এই জন্ম লাভ করেও তা কোন কাজে যখন লাগলো না তখন আর এ জীবন রেখে কি লাভ হবে। তিনি সর্বপাপহরা গঙ্গায় ঝাঁপ দিয়েই আত্মহত্যা করবেন ঠিক করলেন! প্রিয়তমা প্রাণপ্রতিমা সুধাংশুবালার সাথে আর দেখা তাঁর হবে না।

পরলোক সম্বন্ধেও তো তিনি কিছু জানতে পারলেন না।

আত্মহত্যা মহাপাপ তিনি জানেন, কিন্তু কেউ কি জানতে পেরেছে আত্মহত্যা করলে পরলোকে তার কি যন্ত্রণা ভোগ করতে হয়? পরলোক তিনি কোনদিন বিশ্বাস করতে চান নি। তাঁর স্ত্রী মৃত্যুর পর বার বার দেখা দিয়ে জানিয়ে দিয়েছে যে, কিছু আছে যা জানতে গেলে সাধনার প্রয়োজন, কৃচ্ছ্রসাধনের প্রয়োজন, তিতিক্ষার প্রয়োজন।

কোনটাই তাঁর হলো না।

সর্বপাপনাশিনী জাহ্নবীর জলে আত্মবিসর্জন দিয়েই তিনি মনুষ্যজন্মের শেষ করবেন।

মণিকর্ণিকার ঘাটের বাঁধানো সিঁড়ির ওপর তিনি কাপড় বিছিয়ে শুয়ে পড়েন। ধীরে ধীরে মানুষের ভিড় কমে আসে।

শুয়ে শুয়ে তিনি দেখলেন আকাশে পাতলা মেঘের ফাঁকে এক একবার চাঁদ দেখা দিচ্ছে আবার মিলিয়ে যাচ্ছে।

কোন্ তিথি কে জানে!

আকাশের এক কোণে একটা বড় নক্ষত্র টিপ্ টিপ্ করে জ্বলছে।

কি নক্ষত্র ওটা, রোহিণী না উত্তরফাল্গুনী না মৃগশিরা!

মৃত্যুর পর আত্মা যদি ঘুরে বেড়ায় তাহলে ঐ নক্ষত্রটা তো সুধাংশুবালাও হতে পারে।

বার বার তিনি আকাশের দিকে তাকাচ্ছেন আর মনে হচ্ছে যেন ঐ নক্ষত্রটা তাঁর দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে আছে।

নানান রকম ভাবতে ভাবতে নলিনীকান্ত ঘুমিয়ে পড়লেন।

হঠাৎ শেষরাতে তাঁর ঘুম ভেঙে গেলো। মনে হলো কে যেন তাঁর গায়ে হাত বোলাচ্ছে।

: কে! নলিনীকান্ত চমকে উঠে বসলেন। দেখলেন এক বৃদ্ধ তাঁর সামনে দাঁড়িয়ে আছেন।

বৃদ্ধ একটু দূরে সরে গিয়ে বলে ওঠেন: বৎস, গুরু খুঁজছো? কিন্তু পাবে কোথায়? আমি তোমায় সন্ধান বলে দিচ্ছি। তোমার দেশের কাছে বীরভূম জেলায় তারাপীঠে যাও। সেখানে মা তারা আছেন আর আছেন মহাতান্ত্রিক সাধক বামাক্ষেপা। তিনিই তোমায় সমস্ত পথের সন্ধান দেবেন। এই বলে তিনি তাঁর অনেক জটিল প্রশ্নের মীমাংসা করে দিলেন। তাঁর শীতল হস্তের স্পর্শে তাঁর ক্ষুধা তৃষ্ণা দূর হয়ে গেলো, মধুর বাণীতে সমস্ত সমস্যার সমাধান হয়ে গেলো।

হঠাৎ তাঁর ঘুম ভেঙে গেলো।

চারদিক ফর্সা হয়ে এসেছে। দু'-চারজন লোক ঘাটের পথে নামছে। ধীরে ধীরে চারদিক দিনের আলোয় ভরে যায়।

নলিনীকান্ত আর দেরি করবেন না। তিনি পথের সন্ধান পেয়েছেন—সে পথ তারাপীঠের পথ।

॥ ৯ ॥

এখন যেমন তারাপীঠ যাওয়ার সুযোগ-সুবিধা তখনকার দিনে তেমন ছিল না। তীর্থ-পথ যত দুর্গম ও দুষ্কর হয় ততই তার আকর্ষণ বেশী। দুস্তর দুর্ভেদ্য জঙ্গলাকীর্ণ পাহাড় পর্বত পার হয়ে মানুষ চলে যায়, কোন সংশয়ই তার মনে আসে না। এখন বিজ্ঞানের যুগ। পথ ঘাট সুগম হয়েছে। পাঁচ ঘণ্টার পথ এক ঘণ্টায় চলেছে মানুষ। তাই তীর্থেরও আকর্ষণ কমে এসেছে। এখন যাঁরা আসেন তাঁদের অধিকাংশই আসেন বেড়াতে, দেবদর্শন করতে নয়।

এখন যেখানে তারাপীঠ রোড স্টেশন হয়েছে, সেখান থেকে মাইল তিনেক গেলেই তারাপীঠ। চলে যাওয়া যায়। রামপুরহাট রেল স্টেশন থেকে আজকাল সোজা বাস চলে যাচ্ছে মা তারার মন্দিরে। বাসে ভাড়াও তেমন বেশী নয়। পঁয়ত্রিশ পয়সাতেই মায়ের চরণে গিয়ে আশ্রয় পাওয়া যাচ্ছে।

সেদিন আর এদিনে অনেক তফাৎ। নলিনীকান্ত সকালবেলায় মল্লারপুর স্টেশনে পৌছালেন। মল্লারপুর তারাপীঠ রোড স্টেশনের আগের স্টেশন। কোন যানবাহন তখন পাওয়া যেতো না। তিনি হাঁটা শুরু করলেন। হাঁটতে হাঁটতে ভর দুপুরের আগেই চণ্ডীপুরে দ্বারকানদীর ধারে পৌছালেন। সরু নদী, হেঁটেই পার হওয়া যায়। পায়ের পাতা ডোবে না কিন্তু ভয়ানক জলের স্রোত। মনে হয় যেন আছড়ে ফেলে দেবে। নলিনীকান্ত নদীতে নেমে হেঁটে ওপারে গেলেন।

সামনে বিরাট মহাশ্মশান। দীর্ঘ তিন চার মাইল ঘিরে এই মহাশ্মশান। কি গভীর জঙ্গল এই শ্মশান! দিনেরবেলায় যেন ঘোর অন্ধকার। চারদিকে শৃগাল, কুকুর আর শকুনের আনাগোনা। বড় বড় গাছ ডালপালা মেলে উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে। সবাই বুঝি মাতৃরূপ দর্শনের জন্য ব্যগ্র। আশপাশে বন-ঝোপ লতাগুল্ম জাল পেতে আছে। এর মাঝখান দিয়ে কোথাও সরু এক-পেয়ে পথ। কারা এ পথে আসে যায় তা কে জানে। কখনও কখনও দূর-দূরান্তের সাধুরা এখানে এসে থাকেন।

নলিনীকান্ত ডালপালা সরিয়ে চলেছেন।

চারপাশে মানুষের হাড়, কঙ্কাল, নরমুণ্ড ছিটানো রয়েছে। কোন

কোন জায়গায় শিয়াল কুকুরে মৃতের একটা কাঁচা মাংসযুক্ত হাত নিয়ে টানাটানি করছে।

নলিনীকান্ত মনে মনে ভয় পান। এ তিনি কোথায় এলেন! তিনি এগিয়ে চলেছেন। এই মহাশ্মশানে অধিকাংশ মৃতদেহই মাটিতে সমাধি দেওয়া হয়। কুকুর শিয়াল মাটি খুঁড়ে সেই মৃতদেহ ছিঁড়ে ছিঁড়ে খায়।

আরও কিছু দূরে মা তারার মন্দির। বশিষ্ঠের আরাধিতা মা তারার বিগ্রহ এখানে সিদ্ধপীঠ বলে সবাই জানে। এই বশিষ্ট সূর্যবংশের রাজা দশরথ বা রামচন্দ্রের গুরু নন। বৌদ্ধযুগে একজন বশিষ্ঠ ছিলেন। তিনি এখানে আরাধনা করে মা তারার কৃপা লাভ করেছিলেন। তপস্বী সাধক বশিষ্ঠ এখানে সিদ্ধিলাভ করেছিলেন।

সাধক বশিষ্ঠ মা তারাকে যেন আরাধনায় ঘুম পাড়িয়ে রেখেছিলেন, বাংলার তান্ত্রিক শিরোমণি বামাক্ষেপা তারাকে জাগালেন। বাংলার এক প্রান্ত থেকে আর এক প্রান্তে এমন কি ভারতবর্ষেরও সর্বত্র এই মহাতান্ত্রিকের নাম ছড়িয়ে পড়লো। মা তারার বিগ্রহ জীবন্ত হয়ে উঠলো—

বামাক্ষেপা সবাইকে ডাক দিলেন এই জীবন্ত বিগ্রহের কাছে। তাই আজ মা তারা কাতর হয়ে হাত বাড়িয়ে ডাকছেন।

নলিনীকান্ত বুঝতে পারলেন যে এই মনোরম পরিবেশ তন্ত্র সাধনারই জায়গা। চারদিকে একটা বিরাট গাম্ভীর্য। তিনি ভয়ে ভয়ে এগিয়ে চলেছেন মন্দিরের দিকে। মন্দিরের এক পাশে করবী বন। সেই করবী গাছের একটা ডাল ধরে কে যেন দাঁড়িয়ে আছে কার প্রতীক্ষায়। নলিনীকান্ত দেখলেন অর্ধনগ্ন একটি লোক ডাল ধরে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে হাসছে। তার চোখ দুটো যেন জ্বলছে।

নলিনীকান্ত সোজা গিয়ে তাঁর পা দুটো জড়িয়ে ধরে অঝোর ধারায় কাঁদতে লাগলেন।

লোকটি হাসছে।

নলিনীকান্ত কাঁদছেন।

কিছু পরে লোকটি বলে উঠলো: ওরে ওঠ, তোর জন্য যে আমি অপেক্ষা করে আছি। আয়, এবার বুকের মধ্যে আয়।

লোকটি এবার নলিনীকান্তকে বুকে জড়িয়ে ধরে বললেন: কিছু ভাবিস নে, ঠিক জায়গায় তুই এসে গেছিস। আবার তোর ভাবনা কি? কান্না থামা,

কতদূর থেকে এসেছিস, আগে একটু সুস্থ হয়ে নে, তারপর তোকে সব বলবো, সব দেখাবো।

ইনিই মহাতান্ত্রিক সাধক বামাক্ষেপা।

নলিনীকান্ত সুস্থ হলে বামাক্ষেপা বললেন: হ্যাঁরে, তুই কি চাস বল তো!

নলিনীকান্ত যে স্ত্রীকে ফিরে পাবার আশায়, তার সাথে পুনর্মিলনের আশায় জগন্মাতার সাধনা করতে এসেছেন, সে কথা উচ্চারণ না করে মন্ত্রপ্রাপ্তি থেকে শুরু করে আত্মহত্যার কথা সব কিছু বললেন। তিনি হাতজোড় করে বললেন: বাবা, আমাকে কৃপা করুন।

মহাসাধক জ্ঞানতপস্বী বামাক্ষেপা তাঁর মুখের দিকে চেয়ে রইলেন। এই তরুণ যুবক আর দশজনের মতন যে সাধারণ নয়, সে যে সাধক হয়েই পৃথিবীতে এসেছে, জগতের কল্যাণের জন্য, মুমূর্ষু মানুষের ব্যথা-বেদনার ভাগীদার হওয়ার জন্যই যে তার জন্ম হয়েছে, এ কথা বামাক্ষেপা বুঝতে পারলেন। শক্তিমান সাধকের হৃদয় একটা আয়না। এই আয়নায় তাঁরা বুঝি সব কিছুই দেখতে পান। বামাক্ষেপা বললেন: ওরে, আমার তারা মা-ই তো এ দুনিয়ায় সব। এই দুনিয়ার সব কিছুই তাঁর মধ্যে। তিনিই জীবপালিনী—এ বিশ্বের যা কিছু সব তাঁর মধ্যে এসে লয় হয়ে গেছে। আমার মা তারার কাছে তুই যা চাইবি তাই পাবি। পরম ভাগ্যবান তুই; বীজমন্ত্র যা পেয়েছিস সে তো তারামন্ত্র।

একটু থেমে পরে বলেন: হ্যাঁরে, তুই এখানে কি করে এলি! মা ডেকেছেন বলেই তো তুই এসেছিস। তোর যে খিদে পেয়েছে, তাই কাঁদতে কাঁদতে চলে এসেছিস। মা তারার দেখা পেলে তোর আর কিছু ভাবনা থাকবে না—তাহলে তোর সব পাওয়া হয়ে যাবে। কিছু ভাবিস নে, তোকে আমি সব বলে দেবো, মায়ের দেখা তুই পাবি। পরে আপন মনে বিড়বিড় করে বললেন: শালা এবার মরেছে। বৌ বৌ করে পাগল হয়েছিল, এবার মা মা করে পাগল হবে। মা'র দেখা ও পাবেই! ও যদি দেখা না পায় তাহলে আর কে দেখা পাবে? 'জয় তারা' বলে এক হুংকার দিয়ে বামাক্ষেপা শ্মশানের দিকে এগিয়ে চলেন।

নলিনীকান্ত বামাক্ষেপার সঙ্গ ছাড়েন না। কখনও শ্মশানে কখনও মন্দিরে, কখনও দ্বারকাতটে তাঁর সাথে ঘুরে বেড়ান।

যিনি এই বিশ্বকে পালন করছেন, জীবের শুভাশুভর চিন্তায় যাঁর ঘুম নেই, সেই জগজ্জননীর সাধনাই তো মহাশক্তির সাধনা। সমস্ত তন্ত্রশাস্ত্রের মূলই হচ্ছে মাতৃসাধনা। মন্ত্রতন্ত্রের কোন প্রয়োজন নেই। বামাক্ষেপা বলেন: বোকারা জানে না তাই শাস্ত্রপুঁথি ঘেঁটে বেড়ায়। শাস্ত্রপুঁথি পাঠ করে পণ্ডিত হওয়া যায় কিন্তু মায়ের সন্তান হওয়া যায় না। ঘরে যখন মাকে ডাকে তখন কি মন্ত্রপাঠ করে মাকে ডাকে, না সোজা 'মা' 'মা' বলে ডাকে? ঘরের মাকে ডাকতে গেলে যেমন মন্ত্রতন্ত্রের প্রয়োজন হয় না তেমনি মা তারাকে ডাকতে হলেও মন্ত্রতন্ত্র লাগে না। শালারা খিদে পেলে মা'র কাছে গিয়ে কত কাঁদে, তার আঁচল ছিড়ে দেয়, কিন্তু মা তারাকে অমন করে কেঁদে কেঁদে ডাকতে পারে না।

মাঝে মাঝে তিনি নলিনীকান্তকে বলেন: মহাশক্তিকে জাগাতে হলে ভিতরে ব্যবস্থা করতে হবে, বাইরে হোম যজ্ঞ করতে হবে না। ভিতরের যত কামনা বাসনা সব ভিতরেই পোড়াবার চেষ্টা করতে হবে। তবেই তো মহাশক্তি জাগবে। ওরে, মা তারা আমার ভারী দয়াবতী, 'মা' 'মা' বলে কাঁদলে কোলে তুলে নেবেই।

নলিনীকান্ত এই সাধনায় সিদ্ধিলাভ করতে এতদূর এসেছেন। এই সাধনার ওপর নির্ভর করছে তাঁর স্ত্রীর দর্শনলাভ। কিন্তু মহাশক্তির সাধনা করতে যে শক্তির প্রয়োজন সে শক্তি তো তিনি এখনও সঞ্চয় করতে পারেন নি।

নলিনীকান্ত চিন্তিত হয়ে পড়েন মহামায়ার দর্শন তাঁর কি ভাবে হবে। পূর্বজন্মে বা এই জন্মে এমন কি সুকৃতি তাঁর আছে যে তার ফলে এত বড় একটা অসাধ্য সাধন হবে।

বামাক্ষেপার সংস্পর্শে এসে নলিনীকান্ত যেন নতুন মানুষ হয়ে গেলেন। আচরণে বিচরণে তিনি একেবারে অন্যরকম হয়ে গেছেন। সোনার স্পর্শে লোহাও বুঝি সোনাতে পরিণত হয়েছে। তিনি যে শুধু শ্মশানে মশানে ঘুরে বেড়িয়েছেন তা নয়, এই সময়ের মধ্যে তন্ত্রসাধনার সমস্ত নিগূঢ় তত্ত্বগুলো আয়ত্তে এনে ফেলেছেন। রানী রাসমণি এস্টেটের এক সুপারভাইজার জীবনের পতিত জমি জরিপ করছেন এই তারাপীঠে বসে। দলিল দস্তাবেজ আজ সব এখান থেকে বহু দূরে খুলনা জেলার এক অখ্যাত গ্রাম কুমিরাতে হয়তো ধূলায় লুণ্ঠিত হচ্ছে।

আজ তিনি মা তারার আদালতে জীবনের জমি রেজেস্ট্রী করতে এসেছেন, দলিল লিখে দিলেন সাধক বামাক্ষেপা, রেজেস্ট্রী খরচ ভক্তি আর শ্রদ্ধা। সারা জীবন ধরে যে দেহজমির তিনি মালিকানা করেছের্ন তাতে কোন ফসল ফলে নি। তার কোন দাখিলা নেই। এইবার সেই জমি হস্তান্তর হতে চলেছে মা তারার নামে।

এক ঘোর অমানিশার রাতে তান্ত্রিক বামাক্ষেপা নলিনীকান্তকে আসনে বসিয়ে দিলেন ইষ্ট দর্শন লাভের আশায়। ঘন কৃষ্ণবর্ণ অন্ধকার। চারদিকে শিমূল শ্যাওড়া আম জামের গাছ। মাঝে মাঝে শকুনের পাখা ঝাপটানোর শব্দ শোনা যাচ্ছে। গভীর বনের ভিতর দিয়ে বনঝোপ ভেঙে সাপের মত সড় সড় করে কি যেন চলে যায়। শিয়াল কুকুর ছোটাছুটি করছে এদিক ওদিক। একটু আগে বুঝি আবার একটু বর্ষণ হয়ে গেছে। গাছের পাতা বেয়ে টিপ টিপ করে জল ঝরছে। আকাশে একটা নক্ষত্রও নেই; চারদিক নিথর নীরব। মানুষ যে এখানে কিছু বাস করে তা আর এ অন্ধকারে মনে হয় না। সবাই বুঝি সুষুপ্তির কোলে।

শুধু নলিনীকান্ত আসনে একা একা বসে আছেন আর তারামন্ত্র জপ করছেন। মাঝে মাঝে বামাক্ষেপার হুংকার শোনা যাচ্ছে: জয় তারা।

নলিনীকান্ত কেঁপে কেঁপে উঠছেন।

কি একটা জন্তু এসে যেন তাঁর গায়ের উপর দিয়ে চলে গেল। ওপাশে কারা যেন হাসছে আবার এপাশে কারা যেন সুর করে কাঁদছে। নলিনীকান্ত একাগ্রমনে মায়ের নাম করছেন।

আকাশে মেঘ ডেকে ওঠে। বিদ্যুৎও চমকায়। কয়েকটা নরকঙ্কাল এসে তাঁর সামনে যেন নৃত্য করতে শুরু করে।

তিনি চোখ খোলেন না।

কড়্ কড়্ কড়াৎ! কোথায় বুঝি বাজ পড়ে।

নলিনীকান্ত চমকে ওঠেন।

আসন থেকে কিছু দূরে বড় বড় দুটো সাপ ফণা তুলে ফোঁস ফোঁস করতে থাকে।

দেখতে দেখতে রাত্রি এগিয়ে চলে। চারদিকে সব কিছু যেন থেমে যায়।

রাত্রি শেষ হতে আর দেরি নেই। এমন সময় হঠাৎ একটা জ্যোতি তাঁর দেহ থেকে বেরিয়ে গিয়ে একটা সুন্দরী নারীমূর্তি দেখা গেলো।

নলিনীকান্ত অবাক্ হয়ে দেখলেন, তাঁর স্ত্রী সুধাংশুবালা তাঁর সামনে দাঁড়িয়ে হাসছে।

নলিনীকান্ত চমকে গিয়ে বললেন : তুমি কে ? বলো।

: আমি তো তোমার ইষ্ট দেবী।

: কিন্তু আমার গুরু তোমার যে রূপের বর্ণনা করেছেন এ রূপ তো সে রূপ নয়।

: তুমি যে তোমার স্ত্রীকে পাবার জন্য আমার আরাধনা করছো তা আমি জানি। তুমি তো আমাকে চাও না, চাও তোমার স্ত্রীকে। বড় ভালোবাসতে তুমি তাকে। তাকে পাবার জন্যই তো তোমার সাধনা। তাই এই রূপেই তোমাকে দেখা দিলাম। বলো, এবার তৃপ্ত হয়েছো তো ?

: অমি তো কিছু বুঝতে পারছি না, সত্য করে বলো তুমি কে !

: আমিই তারা। আমি যে বিশ্বরূপা, যে কোন সময় যে কোন রূপ আমি ধারণ করতে পারি।

: না না, এ রূপ আমি দেখতে চাই না। তোমার দেবময়ী মূর্তি আমি দেখতে চাই।

: সে রূপ তো তোমাকে একবার দেখিয়েছি।

নলিনীকান্ত তাড়াতাড়ি বলে উঠলেন : কবে, কখন, কই আমার তো মনে পড়ে না !

: তোমার তখন আট বৎসর বয়স। একদিন সন্ধ্যাবেলায় তুমি তোমাদের গ্রামের এক চণ্ডীমণ্ডপে প্রদীপ জ্বালতে গিয়েছিলে, তখন তোমাকে আমার মূর্তি দেখিয়েছিলাম, তুমি ভয়ে পালিয়ে এসেছিলে।

নলিনীকান্তর ধীরে ধীরে সব কথা মনে পড়ে।

এবার তিনি কাঁদতে লাগলেন বালকের মত মাটিতে আছড়ে পড়ে, আর বলতে লাগলেন : মা, আমাকে কৃপা কর। আমি তোমার সেই রূপই দেখতে চাই।

: সে রূপ তুমি সহ্য করতে পারবে না।

: না পারি, না পারবো। যাক আমার দু'চোখ অন্ধ হয়ে, যাক আমার কর্ণ বধির হয়ে, তবুও মা, আমি দেখতে চাই।

রাত্রি শেষের অন্ধকারে মা তারা ধীরে ধীরে এগিয়ে এলেন নলিনীকান্তের সামনে। পরে তাঁর মাথায় পাদস্পর্শ করতেই চারদিক আলোর জ্যোতিতে ভরে গেলো।

সেই জ্যোতিতে মা তারা তাঁর মহামায়া রূপ দেখালেন।

নলিনীকান্ত চিৎকার করে উঠলেন : পারি না, আর সহ্য করতে পারি না। সব জ্বলে গেলো।

দেবীমূর্তি বললেন : তোমার সাধনায় আমি সন্তুষ্ট হয়েছি। বর প্রার্থনা কর।

: আমি কি বর প্রার্থনা করব ?

: কেন, ধন, ঐশ্বর্য, এমন কি তোমার স্ত্রী—

: না না, আমি কিছু চাই না। জ্ঞান, ভক্তি, প্রেম, ধন, ঐশ্বর্য, আমার স্ত্রী আমি কিছুই চাই না। আমি সব পেয়েছি। শুধু তুমিই আমার কাম্য। এই বর আমি চাই, যখন ডাকবো তোমাকে, তখন এই মূর্তিতেই যেন তোমার দেখা পাই।

: তথাস্তু!

দেবী অদৃশ্য হয়ে গেলেন।

নলিনীকান্তর বাহ্যজ্ঞান তখন সুপ্ত।

অনেকক্ষণ পর যখন তিনি চোখ মেললেন তখন চার পাশ দিনের আলোয় ভরে গেছে। নলিনীকান্ত শুয়ে আছেন বামাক্ষেপার কোলে।

নলিনীকান্ত উঠে বসে বামাক্ষেপার পা জড়িয়ে ধরে কাঁদতে লাগলেন : বাবা, আমার প্রতি কৃপা তো হলো না। আমার সাধনা তো সফল হলো না।

: আমি নিজে দেখলাম তোর সব কিছু পাওয়া হয়ে গেলো আর হতচ্ছাড়া বলে কি না কিছু পেলাম না!

নলিনীকান্ত যেন অপরাধীর মত তাঁর দিকে তাকিয়ে থাকেন।

বামাক্ষেপা বলেন : তোকে সন্ন্যাস নিতে হবে। মা তারা তোর ওপর মহাসন্তুষ্ট হয়ে তোকে চাকর রেখেছেন। ভালো করে চাকরি কর। মনিব তোর ওপর সন্তুষ্ট যখন তখন তোর আর ভাবনা কি! জয় তারা!

বামাক্ষেপা মন্দিরের দিকে চলে গেলেন।

নলিনীকান্ত বুঝি সম্পূর্ণ জ্ঞান এখনও ফিরে পান নি। বিস্ময়াভিভূত হয়ে চারদিকে চাইতে লাগলেন।

॥ ১০ ॥

নলিনীকান্ত কুমিরায় ফিরে এলেন। সারাদিন তিনি কাজের ভিতর নিজেকে ডুবিয়ে রাখেন, কিন্তু সন্ধ্যার পর যখন চারদিক ধীরে ধীরে সব নির্জন হয়ে আসে তখন তাঁর স্ত্রীর কথা মনে পড়ে। মনে মনে তিনি মা তারাকে স্মরণ করেন। সঙ্গে সঙ্গে মা তারা সুধাংশুবালার রূপ ধরে তাঁর সামনে এসে দাঁড়ান। সেই রূপ, সেই হাসি, সেই নয়ন ভোলানো চোখের চাহনি। নলিনীকান্তর ইচ্ছা করে তাঁর সঙ্গে স্ত্রীর মত ব্যবহার করতে। এ ভাব তাঁর মনে আসতো না যদি মা তারা তাঁকে স্ত্রীরূপে দেখা না দিতেন। কখনও কখনও তাঁর শয্যার একপাশে এসে হয়তো বসলেন। কিন্তু এ-ভাব কেন? এ বেশ এ রূপ মা কেন ধারণ করেন? এ মূর্তি তো মাতৃ-মূর্তি নয়।

নলিনীকান্ত চিন্তার সমুদ্রে ডুব দেন।

ধীরে ধীরে নলিনীকান্তর দেহ ও মনের পরিবর্তন দেখা গেলো। মাথায় বড় বড় চুল, সারা মুখে দাড়ি, কিন্তু সারা মুখমণ্ডলে যেন একটা জ্যোতি ফুটে উঠতে লাগলো। এ নলিনীকান্ত যেন আগেকার সে নলিনীকান্ত নয়।

একদিন হঠাৎ তাঁর মনে হলো গেরুয়া কাপড় পরবার। বাজার থেকে গেরুয়া রঙ কিনে এনে কাপড় রাঙিয়ে পরে একদিন কাজে চলে গেলেন।

সহকর্মীরা দেখে অবাক্ হয়ে যায়। এ কি বেশ তাঁর! যেন এক নবীন সন্ন্যাসীর আবির্ভাব হয়েছে কুমিরায়।

কুমিরার হেমবাবু নলিনীকান্তকে খুব ভালোবাসতেন। নলিনীকান্তও তাঁর সঙ্গে মনের কথা সব বলতেন। তিনি তাঁর এই বেশ দেখে বললেন: নলিনী, তোমাকে বোধ হয় এবার আমি হারালাম।

নলিনীকান্ত হেসে জবাব দেন: এ কথা কেন!

: তোমার এ বেশ তো আমাদের সঙ্গে মেলে না।

: তাতে কি! কাপড়ই রাঙিয়েছি কিন্তু মন তো রাঙাতে এখনও পারি নি। আপনি আমায় আশীর্বাদ করুন, মনটাকেও যেন এই রঙে রাঙাতে পারি।

নলিনীকান্তর চোখে জল। চোখের জল যেন বাঁধ মানে না। কেন তাঁর চোখের জল পড়ছে, তাও তিনি বলতে পারেন না।

হেমবাবু চমকে যান তাঁর চোখের জল দেখে। বলেন: তোমার চোখে জল কেন নলিনী ?

নলিনীকান্ত কোন কথা বলেন না।

হেমবাবু বলেন: তোমার চোখের জলের পথ বেয়েই তোমার কাম্য বস্তু আসছে। নলিনী, যদি তাঁকে তাড়াতাড়ি চাও তাহলে আরও কাঁদো। হেমবাবু একটু থেমে বলেন: নলিনী, যদি কোনদিন দেশপূজ্য হও সেদিন আমার কথা যেন তোমার মনে থাকে।

হেমবাবু চলে যান।

নলিনীকান্ত তাঁর ঘরে চলে আসেন।

ঘরের ভিতর হ্যারিকেন জ্বলছে? কতকগুলো পোকা তার চার পাশ দিয়ে ঘুরপাক খাচ্ছে। বার বার উড়ে আসছে আর কাঁচের সঙ্গে ঘা খেয়ে পড়ে যাচ্ছে। ঐ পোকাগুলো জানে না যে ওটা আগুন, ওতে পড়লে আর বাঁচতে হবে না। তবুও ওদের কি নেশা, বার বার ঝাঁপিয়ে পড়ছে আর ঘা খেয়ে ফিরে আসছে। নলিনীকান্ত দেখছেন আর ভাবছেন—

আমরাও তো ঐ পোকাগুলোর মত দিন রাত এই সংসারে বোকার মত ঘা খেয়ে খেয়ে বেড়াচ্ছি। স্ত্রী-পুত্র-কন্যা আত্মীয়-স্বজন বন্ধু-বান্ধব সব যেন ঐ কাঁচের বেড়ার মধ্যে বার বার হাতছানি দিয়ে ডাকছে, বার বার আমরা ছুটে যাচ্ছি, আর ব্যথা বেদনাহত হয়ে ফিরে আসছি। যতক্ষণ যাচ্ছি আর ফিরে ফিরে আসছি ততক্ষণই আমরা বাঁচছি। কিন্তু একটু রাস্তা পেলেই আমরা ঝাঁপিয়ে পড়ছি, আর পরিণাম হচ্ছে, অসহ্য জ্বালা-যন্ত্রণার পর মৃত্যু হচ্ছে আমাদের। স্নেহ প্রেম ভালোবাসা সবই ঐ কাঁচের বেড়া। মানুষ আকৃষ্ট হচ্ছে আর পিষ্ট হয়ে শেষ হয়ে যাচ্ছে। তবে! কোথায় পাবে আশ্রয় এই মানুষ, যেখানে আশ্রয় পেলে এই মানুষ নিরাপদে থাকবে, কোন ঝড়-ঝাপটা লাগবে না। কে বলে দেবে সেই আশ্রয়ের সন্ধান ? মা, মাগো, এ মানুষের মুক্তি হবে কেমন করে ? এ ত্রিতাপদগ্ধ মানুষ কিভাবে একটু শান্তি পাবে ?

হঠাৎ দেখেন ঘরের এক পাশে মা তারার আবির্ভাব হয়েছে সুধাংশুবালার রূপ ধরে।

নলিনীকান্ত এ রূপে আর তাঁকে দেখতে চান না। মহাশক্তির এ

রূপ দেখার সাধ আর তাঁর নেই। তিনি বলে উঠলেন: এ রূপে আর তোমাকে দেখতে চাই না, তুমি আমার সামনে থেকে চলে যাও, আমি আর সহ্য করতে পারছি না।

দেবী চলে যান।

নলিনীকান্ত চিন্তা করেন—কে এই জগজ্জননী তারা? তাঁর প্রকৃত রূপই বা কি? আর আমি? আমিই বা কে? এ পৃথিবীতে আমার অস্তিত্বই বা কেন? কেন আমি এ পৃথিবীতে এসেছি? আমি যাবই বা কোথায়? জানতে হবে—কে বলবে এ সব প্রশ্নের উত্তর?

আবার তিনি ছুটলেন তারাপীঠ। সোজা গিয়ে বললেন: বলুন আমি কে? সাধনবলে আমি মা তারাকে পেয়েছি, মা তারার আমার থেকেই তো প্রকাশ হয়েছে।

বামাক্ষ্যেপা ক্রোধে ফেটে পড়লেন—কি! মা তারা তার থেকে প্রকাশ হয়েছে! এ ছোঁড়া কি পাগল? এ বিশ্ব যিনি সৃষ্টি করেছেন, যিনি সমস্ত জীবকে লালন-পালন করছেন, তিনি তার থেকে প্রকাশিতা? অর্বাচীন আর কাকে বলে? বামাক্ষেপা কিছু না বলে ক্রোধে কাঁপতে কাঁপতে মন্দিরের ভিতর চলে গেলেন।

কিছুক্ষণ পর তিনি বেরিয়ে এলেন। তখন সে রাগ আর তাঁর নেই। তিনি বললেন: শোন, তুই বেটা আস্ত বোকা। তুই কে তা কি এক নিমেষেই জানা যায়, না কেউ জানতে পারে? আগে সন্ন্যাসী হ, তবে তো জানবি তুই কে!

: বেশ, তবে আমাকে সন্ন্যাস দিন।

: উহুঁ:, সে আমার দ্বারা হবে না। তোকে শংকর সম্প্রদায়ের সন্ন্যাসী হতে হবে। তুই জ্ঞানপন্থী গুরুর সন্ধান কর। তোর সব আশা পূরণ হবে। যা যা, আর দেরি করিস নে।

নালনীকান্ত তারাপীঠ থেকে বিদায় নেন।

বামাক্ষেপা তাকিয়ে তাকিয়ে দেখেন আর মনে মনে বলেন: শালা, মা তারাকে একেবারে বেঁধে ফেলেছে। তারপর 'জয় তারা' বলে চলে যান।

॥ ১১ ॥

নলিনীকান্তর চাকরিতে কোন মোহ নেই। পশু পক্ষী তাদের যদি দিন চলে তবে তাঁরও দিন ঠিক চলে যাবে। সংসারের সাধ তো তাঁর মিটে গেছে। এবার তাঁর ছুটি। সংসারে থেকে মানুষের যে চরম দুঃখ-কষ্ট তা তিনি নিজে দেখেছেন। কি জ্বালা! কি যন্ত্রণা! কি নিদারুণ সংগ্রাম জীবনের সঙ্গে তা তিনি প্রত্যক্ষ করেছেন। স্নেহ প্রেম ভালোবাসা দিয়ে যে সংসার বাঁধা, সেখানে তিনি দেখেছেন হাহাকার, আর্তনাদ। চোখের জলে কত সংসার ভেঙ্গে গেলো, কাঁদতে কাঁদতে কত চোখ অন্ধ হয়ে গেলো। তবুও মানুষের কি নেশা! সংসার পাতবে, ভালোবাসবে, হাসবে, খেলবে, কাঁদবে। এর হাত থেকে পরিত্রাণ পেতে হবে! আর দশজনকেও বাঁচাতে হবে!

নলিনীকান্ত চাকরি ছেড়ে দিলেন। সংবাদ চলে এলো কুতুবপুরে। ভাঙা সংসারে যেন বজ্রাঘাত হলো।

ভুবনমোহন ভাবলেন, নলিনীর কি হলো; তিনি আর ক'দিন, তারপর সংসার চলবে কি করে।

কেউ বললেন: এ আবার কেমন ছেলে! বুড়ো বাপ, তাঁকে দেখবে না? ও-রকম সন্ন্যাসী হয়ে লাভ কি?

ভুবনমোহন জবাব দেন: নলিনী আমার সে রকম ছেলে নয়। জীবনে সে কোনদিন অন্যায় করে নি। আর তা ছাড়া সে যদি সংসার ত্যাগ করে সন্ন্যাসী হয় সে তো আমার পরম সৌভাগ্য। ঈশ্বর কি, কেমন করে তাঁর সন্ধান পাওয়া যায়, সে কাজ তো আমি কোনদিন করতে পারি নি, আর সে যদি আজ সেই পথেরই পথিক হয় তাতে আমি বাধা দেবো না।

পরম আত্মীয় যুধিষ্ঠির চট্টোপাধ্যায় নলিনীকে বড় ভালোবাসতেন। এ সংবাদ তাঁর বুকেও বড় লেগেছে। তিনি বললেন: নলিনী আবার ফিরে আসবে। এত বড় সংসারের ভার তুমি যে বহন করতে পারবে না সে তা জানে। কিন্তু আমি ভাবছি আর এক কথা। যে নিজে হাতে এক গ্লাস জল গড়িয়ে খেতে পারে না, কাপড়টাও বোধ হয় ভালো করে নিজে পরতে পারে না, সে কি করে সংসারের মায়া ত্যাগ করবে?

: সংসার সম্বন্ধে যদি তার অশ্রদ্ধা হয়েই থাকে হোক! ছোট ছোট ভাই বোন রয়েছে, তাদের কথাও কি একবার তার মনে পড়বে না? কে জানে—একটু চুপ করে থেকে বলেন: সবই অদৃষ্ট যুধিষ্ঠির! তা নইলে ওর মা এত আগে সরতে পারতো না।

ভুবনমোহন বালকের মত কাঁদতে লাগলেন। চোখের জলে সব যেন ভেসে যাচ্ছে।

নলিনীকান্তও বুঝি ভাসতে ভাসতে চলেছেন এই চোখের জলে। চলেছেন নতুন পথের সন্ধানে—জানে না সে পথের শেষে পৌঁছাতে পারবে কি না!

নলিনীকান্ত গুরুর সন্ধানে কাশী চলে এলেন। তিনি আগে থেকেই জানতেন যে ভারতবর্ষের যত বড় বড় সাধুর আগমন নিগমন এই কাশীতে। এখানে নিশ্চয়ই তিনি তাঁর গুরুকে পাবেন।

কাশীতে তখন কৃষ্ণানন্দ স্বামী, ভাস্করানন্দ স্বামীর খুব নাম প্রতিপত্তি। নলিনীকান্ত তাঁদের সঙ্গেও আলাপ আলোচনা করলেন। তাঁর চেহারা দেখে সবাই আকৃষ্ট হতে থাকেন। এমন সুন্দর সুঠাম যুবক সন্ন্যাসী দেখলে অনেকেরই কৌতূহল হয়। এমন সুন্দর চেহারা, এই সামান্য বয়স। এ বয়সে কেন এ পথে নামলেন? তিনি তো অনায়াসে সংসার-ধর্ম পালন করতে পারতেন, সন্ন্যাস জীবনের এই কষ্টকে বরণ করে নেবার তাঁর কি প্রয়োজন ছিল! অনেকে কৌতূহলবশতঃ তাঁকে নানারকম প্রশ্ন করতে থাকায় তিনি বাধ্য হয়ে কাশী ত্যাগ করে বৃন্দাবনে এলেন।

ভগবান শ্রীকৃষ্ণের লীলাক্ষেত্র বৃন্দাবন। বৈষ্ণব সাধু মহাত্মায় ভরা এই বৃন্দাবন। নলিনীকান্ত একজন বৈষ্ণবের আতিথ্য গ্রহণ করলেন। তিনি বৃন্দাবনের পথে পথে ঘুরে বেড়ান গুরুর খোঁজে কিন্তু গুরুর কোন সন্ধান পান না। সারাদিন ঘুরে ঘুরে ক্লান্ত হয়ে তিনি সন্ধ্যার পূর্বে এসে বৈষ্ণবের ঘরে আশ্রয় নেন।

একদিন নলিনীকান্তকে ঐ বৈষ্ণব জিজ্ঞাসা করলেন: আচ্ছা বাবা, তুমি সারাদিন কি খুঁজে বেড়াও? সারাদিন রোদে ঘুরে ঘুরে তোমার সোনার মুখখানা যে কালি হয়ে গেলো।

নলিনীকান্ত বলেন: গুরুর সন্ধান করে বেড়ানোই আমার কাজ। কিন্তু

ভাগ্য আমার বিরূপ, তাই সন্ধান পাচ্ছি না। আপনি আমায় আশীর্বাদ করুন, আমি যেন আমার গুরুকে খুঁজে পাই।

বৈষ্ণব-গৃহী নলিনীকান্তর দিকে চেয়ে বললেন: তোমার এই স্বল্প বয়স। আধ্যাত্মিক জগৎ সম্বন্ধে তোমার কতটুকু ধারণা হয়েছে? তুমি ভুল করছ—গুরু কোনদিন কারও কি হারায়, না তাঁকে খুজতে হয়? যে কোনদিন হারায় নি, হারাতে পারে না তাঁকে তুমি বৃথাই খুঁজে বেড়াচ্ছো। গুরু খুঁজতে কি বনে যেতে হয়! তোমার মনের মধ্যেই তো গুরু রয়েছেন। তোমার সমস্ত মনের মন্দির আলো করে তিনি তোমাকে চালিয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছেন। প্রাণ খুলে তাঁকে তুমি ডাকো, নিশ্চয়ই তিনি সাড়া দেবেন।

নলিনীকান্ত চুপ করে শুনছেন। এ কথায় তিনি যেন আশ্বস্ত হতে পারেন না।

আবার বৈষ্ণব বলেন: বাবা, তুমি এক কাজ করো, আমার এক পরমা-সুন্দরী কন্যা আছে, তুমি তাকে বিয়ে করে সংসার-ধর্ম পালন করো। সংসারে থেকেও পরমার্থের সন্ধান পাওয়া যায়। গেরুয়া পরে বনে পাহাড়ে ঘুরে সাধন ভজন করে ইষ্টের সন্ধান পাওয়া হয়তো খুব কঠিন নয়, কিন্তু সংসারে থেকে ঈশ্বর সাধনা করে যে পরম বস্তুর সন্ধান পায় সেই তো প্রকৃত সাধক। তুমি বৃথা সময় নষ্ট করো না।

নলিনীকান্ত আর কোন কথা বলেন না। মনে মনে ভাবেন, তিনি সবই বুঝতে পেরেছেন। বৃন্দাবনও তাঁকে আশ্রয় দিলো না। যমুনার কালো জলে আলো পড়লে কেমন দেখায় তা আর তাঁর ভাগ্যে দেখা হলো না।

তিনি বৃন্দাবন ছেড়ে মথুরা, অযোধ্যা, হরিদ্বার গেলেন। কিন্তু মেলে কই? যা চাই তা পাই কই?

নলিনীকান্ত আজমীরে চলে এলেন।

এই দীর্ঘ সময়ের ভিতর তাঁর দেহ-মনের ওপর দিয়ে প্রচণ্ড জল-ঝড় হয়ে গেছে। কতদিন তাঁর ক্ষুধার অন্ন জোটে নি, কতদিন তাঁকে বিনিদ্র রজনী কাটাতে হয়েছে। শরীর ক্লান্তিতে অবসন্ন হয়ে পড়েছে। নৈরাশ্য এসে তাঁর চোখে মুখে কালো ছায়া ফেলেছে, কিন্তু তবুও তিনি আশা হারান নি।

পূর্ণানন্দ স্বামী বলেছেন, তাঁর গুরু নির্দিষ্টই আছে। সময়মত দেখা পাবেন। তারাপীঠের অবধূত বামাক্ষেপা বলেছেন, গুরু তাঁর মিলবেই।

তবে? তাঁদের কথা কি সত্য হবে না?

নিশ্চয়ই হবে। বাক্‌সিদ্ধ মহাপুরুষদের কথা কখনও মিথ্যা হয় না। যাঁরা অমাবস্যার রাতে পূর্ণিমার চাঁদ দেখাতে পারেন, বিষধর সাপকে যাঁরা স্ববশে আনতে পারেন, দেব-দেবতাকে যাঁরা প্রত্যক্ষ করেন, তাঁদের কথা মিথ্যা হলে চন্দ্র-সূর্যও মিথ্যা হয়ে যাবে।

নলিনীকান্ত আজমীরে এক গাছের তলায় বসে আছেন। এখান থেকে কিছু দূরে পুষ্করতীর্থ। তার থেকে আরও কিছু দূরে সাবিত্রী পাহাড়। নলিনীকান্ত হঠাৎ বিস্মিত হয়ে দেখেন, রাস্তা বেয়ে কাতারে কাতারে লোক চলেছেন। কে জানে আজ কোন্ তিথি! হয়তো কোথাও কোন উৎসব আছে।

তিনি একজনকে জিজ্ঞেস করে জানলেন যে, আজমীরে এক বড় ধর্মসভা হচ্ছে। সেখানে এক বড় সাধু বেদান্তের ব্যাখ্যা করবেন, তাই শুনতে সবাই চলেছে।

নলিনীকান্ত আর বসে থাকতে পারলেন না, তিনিও তাদের সঙ্গী হলেন।

নলিনীকান্ত সভাস্থলে গিয়ে দেখতে পেলেন যে মঞ্চের ওপর এক বিরাট-দেহী সাধু বসে বেদান্ত সম্বন্ধে বক্তৃতা দিয়ে চলেছেন। তিনি ভিড় ঠেলে ঠেলে মঞ্চের কাছাকাছি এসে থমকে দাঁড়ালেন অবাক্ বিস্ময়ে।

এঁকে তিনি চিনতে পেরেছেন! এই সাধুই তো বাংলার এক গ্রামে রাত্রে তাঁর সামনে জ্যোতির্ময় রূপ নিয়ে তাঁর হাতে একাক্ষরী মন্ত্র দিয়েছিলেন। এই তো তাঁর গুরু! এই তো পেয়েছেন। তিনি "এই তো পেয়েছি" "এই তো পেয়েছি" বলে ভিড় ঠেলে মঞ্চের ওপর গিয়ে তাঁর পায়ের ওপর আছড়ে পড়লেন।

উপস্থিত সবাই চিৎকার করে উঠলো: পাগল হঠাও। ওকে বের করে দাও।

আচার্য সচ্চিদানন্দ চারদিকে হৈ চৈ শুনে তাঁর বক্তৃতা থামালেন। তিনি দেখলেন কে একজন যুবক তাঁর পা জড়িয়ে ধরে মঞ্চের ওপর পড়ে আছে। সচ্চিদানন্দ তাকে ধরে তুলে বললেন: এই, তোম্ কিসি আস্তে এধার আয়া, বোল, কেয়া তোম্‌কা বাসনা।

নলিনী কাতর ভাবে বললেন: আপকো সাথ হাম যানে মাংতা।

সচ্চিদানন্দ ধমক দিয়ে বললেন: কভি নেহি, তোম ভোগী হ্যায়। সংসার ছোড়কে কাহে তোম বাহার হুয়া, চলা যাও—ইধার মছলীখোর

বাঙ্গালীকো জরুরৎ নেহি হ্যায়। তোমকো সংসার মাংতা আউর তোম সাধু হোনে আয়া হ্যায়! এ ঠিক নেহি, চলো বাবা, পিছে হটো।

কিন্তু নলিনীকান্ত ছাড়বার পাত্র নন। একবার যখন পেয়েছেন তখন আর ছাড়বেন না।

তিনি সচ্চিদানন্দের সঙ্গে পুষ্কর আশ্রমে এলেন। আশ্রম-জীবন কত কঠোর তা তাঁর কোনদিন ধারণা ছিল না। আশ্রমে তিনি সবরকম কাজই করতে লাগলেন। বন থেকে কাঠ কেটে আনা, রান্না করা, বাগান পরিষ্কার করা, বাসন মাজা, ঘর ঝাঁট দেওয়া, মাটি কোপানো, এমন কি গরুর জন্য ঘাসও তিনি কাটতেন। কোন কাজে একটু ত্রুটি হলে গুরুজীর বকুনি খেতে হতো। কখনও ভয়ানক গালাগালি দিতেন।

যে কাজ তিনি কখনও করেন নি, সে কাজও তিনি অম্লান বদনে করে যেতেন। মাঝে মাঝে গুরুজীর ব্যবহারে তিনি এত ব্যথা পেতেন যে, আশ্রম থেকে পালিয়ে যাবার পরিকল্পনাও তিনি করেছিলেন।

কিন্তু গুরুভাই ব্রহ্মানন্দ তাঁকে বলতেন: ভাই, অত অধৈর্য হলে তো চলবে না। গুরুদেবের এই যে নির্যাতন এও একটা পরীক্ষা। সন্ন্যাস জীবনে এ সব সহ্য না করতে জানলে পরমার্থের পথের সন্ধান মিলবে না। এই পরীক্ষার ভিতর দিয়ে আমাদের এই জীবনের মান অভিমান, মনের যত অহংকার সব কিছুর অবসান ঘটছে। উনি ঘষে ঘষে আমাদের ওপরের সব গ্লানি ধুয়ে ফেলে খাঁটি জিনিসটুকু প্রকাশ করছেন। উনি আসলে মোটেই নিষ্ঠুর নন। উনি যে কত স্নেহবৎসল তা তুমি পরে বুঝতে পারবে।

নলিনীকান্ত কোন জবাব দেন না। তিনি তো সুখ ভোগের জন্য এ পথে আসেন নি—দুঃখ-কষ্টকে বরণ করে নিত্য সুখের সন্ধানে এসেছেন।

অবসর সময় শাস্ত্রাদি পাঠ করেন।

ধীরে ধীরে নলিনীকান্ত সচ্চিদানন্দর প্রিয় পাত্র হয়ে উঠলেন। তিনিও তাঁকে ভালোবেসে ফেললেন।

সচ্চিদানন্দ আজকাল আর বেশী গালাগালি দেন না। মাঝে মাঝে তাঁকে আদর করে কাছে ডাকেন। বলেন: বেটা, তোমার বহুৎ তকলিফ্ হোতা হ্যায়। তোম কাহে ইহা গির পড়া হ্যায়। চলা যাও, হাম বোলতা তোমারা কাম সব পাকা হো যায় গা। তোম ফালতু আদমী নেহী হ্যায়।

নলিনীকান্ত অনুনয় করে বলেন : হাম কভি নেহী যায়েগা, আপকা গোড় পর হামারা জীবন ছুট যায় ওভি আচ্ছা হ্যায়।

সচ্চিদানন্দ হাসছেন। যেন নলিনীকান্তর সব কিছু তাঁর মন-দর্পণে ধরা পড়েছে।

নলিনীকান্তর ওপর সেদিন রান্নার ভার পড়েছে। উনুনে ভাত চাপিয়ে অদূরে অবস্থিত গুরুদেবের মুখের দিকে একদৃষ্টে চেয়ে আছেন। সচ্চিদানন্দ সরস্বতীর সারা মুখে কি এক অপূর্ব জ্যোতি ফুটে উঠেছে। এ কি রূপ! এ রূপ কি মানুষের সম্ভব! কি বস্তু ইনি পেয়েছেন যে সারা মুখমণ্ডল এমন ঐশ্বরিক জ্যোতিতে উদ্ভাসিত হয়েছে! কি শক্তির বলে তিনি এই রূপ ধারণ করেছেন।

ভাতের হাঁড়িতে ভাত পুড়ে একাকার হয়ে যায়। পোড়া গন্ধে চারদিক ভরে যায়। গুরুদেব অকথ্য ভাষায় নলিনীকান্তকে গালাগালি দেন।

নলিনীকান্ত মনে মনে বলেন : কেন যে এমন হলো তা তুমি জানলে আর এমন ভাবে বকতে না।

নলিনীকান্ত ভয়ে আর কথা বলেন না। তিনি পূজোর ঘরে গিয়ে ঢোকেন।

পুষ্কর আশ্রমে নারায়ণ মূর্তি আছে। ক'দিন থেকে পূজোর ভার নলিনীকান্তর ওপর পড়েছে। কিন্তু কি ভাবে পূজো করতে হয়, কি তার মন্ত্র তা তো তিনি জানেন না! তা ছাড়া ধাতুর তৈরী মূর্তি তো পাষাণের মত। ও তো আর জাগ্রত নয়। তাই তিনি পূজো করতে বসে কোনমতে দুটো ফুল বেলপাতা দিয়ে উঠে আসেন। যিনি পাষাণ। যাঁর কোন প্রাণ নেই তাঁর পূজো এর চেয়ে আর বেশী কি হবে। তিনি কতদিন ঐ পুতুল প্রতিমা নারায়ণমূর্তিকে মাজবার সময় জোরে জোরে চড় মেরেছেন।

এ কাজে নলিনীকান্তের ভারী আনন্দ হতো। যাঁর প্রাণ নেই তাকে মারলে কি অপরাধ হয়? এই মনোভাব নিয়ে নলিনীকান্ত পূজাও দায়সারা গোছের করতেন।

কিন্তু সচ্চিদানন্দ ত্রিকালদর্শী বৈদান্তিক সাধু। তিনি সব কিছু বুঝতে পারতেন। তাই তিনি একদিন নলিনীকান্তকে একটা চড় মেরে বললেন : ফাঁকিবাজ আদমী। ইসকো নাম পূজা!

নলিনীকান্ত লজ্জায় মাথা নীচু করে চলে এলেন পূজোর ঘরে। সিংহাসনের ওপর নারায়ণ বসে আছেন। নলিনীকান্তের চোখ দিয়ে জল গড়াচ্ছে। জোরে জোরে কাঁদতে পারছেন না, পাছে গুরুদেব টের পেয়ে যান। নারায়ণ মূর্তি তার দিকে চেয়ে যেন হাসছে। নলিনীকান্ত বললেন: তোমার জন্যই তো আজ আমার এই শাস্তি। বড় মজা লাগছে তোমার। কই, আমার জন্য তো তোমার কষ্ট হচ্ছে না। তুমি কেমন ধারা নারায়ণ?

নলিনীকান্ত ধীরে ধীরে ঘর থেকে বেরিয়ে আসেন।

সচ্চিদানন্দ ডাক দেন নলিনীকান্তকে: ইধার আও!

তারপর তাঁকে যা বললেন তার মানে হয় যে, বিগ্রহের যখন কোন প্রাণ নেই তখন কার সঙ্গে সে কথা বলছিল এতক্ষণ। বিগ্রহেরই প্রাণ আছে, আর যা, সব মরা।

নলিনীকান্ত এ কথা সে কথার পর দীক্ষা দানের কথা বলেন।

সচ্চিদানন্দ বলেন: পিতা-মাতাকো বিনা অনুমতিসে দীকসা নেহি হোগা।

নলিনীকান্ত তাড়াতাড়ি বলে ওঠেন: কোন্ বাবা মা আছে এ দুনিয়ায় যে তার সন্তানকে সন্ন্যাস গ্রহণের অনুমতি দেয়? স্বয়ং ব্যাসদেব শুকদেবকে সন্ন্যাস গ্রহণের অনুমতি দেন নি। শংকরাচার্য মাতার অনুমতি আদায়ের জন্য চাতুরীর আশ্রয় নিয়েছিলেন।

সচ্চিদানন্দ হাসতে হাসতে বললেন: আরে বাপ্‌রে, তোম্‌সে বচনমে কোই নেহী সাকেগা। তোমকো দীক্‌সা মিল যানা চাহে।

কয়েক দিন পর নলিনীকান্তের সন্ন্যাস দীক্ষা সম্পন্ন হয়ে গেল। দীর্ঘ প্রতীক্ষার অবসান হলো। এতদিন যা তিনি চেয়েছিলেন তাই পেয়ে আনন্দে বলেকের মত নৃত্য করতে লাগলেন। ব্যর্থ জীবন যেন এক লহমায় আলোয় আলো হয়ে গেলো।

নলিনীকান্তর নতুন নাম হলো নিগমানন্দ সরস্বতী।

নলিনীকান্ত নিগমানন্দ সরস্বতী হলেন ১৩০৯ সালের ১১ই ভাদ্র। এদিনটা তাঁর জীবনের এক পরম লগ্ন।

নিগমানন্দর আজ সন্ন্যাসীর বেশ। মস্তক মুণ্ডিত, পরনে গেরুয়া, সারা অঙ্গে তিলক লেপা। সারা দেহ দিয়ে যেন জোছনার আলো বের হচ্ছে।

॥ ১২ ॥

নিগমানন্দের মাঝে মাঝে সচ্চিদানন্দের পূর্বাশ্রমের কথা জানবার কৌতূহল হয়। পরে তিনি তাঁর ভক্তদের কাছে সে কাহিনী বর্ণনা করেন।

১৮৮৩ সালে যখন কাবুলের দোস্ত মহম্মদ খাঁর সঙ্গে ইংরেজের যুদ্ধ বাধে তখন লর্ড অকল্যাণ্ডের অধীনে তিনি একজন হাবিলদার ছিলেন। পেশোয়ারের কিছু দূরে তাঁদের ছাউনি ছিল। তিনি প্রতিদিন রাতে পাহাড়ের ওপর একটা আলো দেখতে পেতেন। মনে হতো কে যেন আলোকপাত করে কাকে ইশারা করে ডাকছে। একে তখন যুদ্ধ চলছে, চারদিকে গুপ্তচর ঘুরে বেড়াচ্ছে। কে জানে কোন গুপ্তচর ঐ কাজে রত আছে কি না। সৈনিক ছাউনির ভিতর একটা চাঞ্চল্য দেখা দিলো। যদি সত্যই এ কোন গুপ্তচরের কাজ হয় তাহলে এখান থেকে ছাউনি সরিয়ে ফেলতে হবে। লর্ড অকল্যাণ্ড একদল সৈন্য পাঠালেন ঐ আলোকপাত সম্বন্ধে সঠিক তথ্য জানবার জন্য। কিন্তু সবাই ফিরে এলো, কেউ কিছু বুঝতে পারলো না। তারপর তিনি একাই বের হলেন ঐ রহস্য উদ্‌ঘাটনের আশায়।

লর্ড অকল্যাণ্ড বললেন: এ রহস্য যদি তুমি সমাধান করতে পারো তোমার প্রমোশন হবে।

অন্ধকার রাত। ঐ আলো লক্ষ্য করে একা একা তিনি চলেছেন। মনে কোন ভয় নেই, কোন আপনজনই হয়তো ওখানে আছে, নইলে এমন করে ইশারা করবে কেন!

এক একটা পাহাড়ের চূড়া ডিঙিয়ে তিনি চলেছেন। পেছনে তাকানোর তাঁর কোন অবসর নেই। ঐ আলো লক্ষ্য করে তিনি দুর্জয় বীরের মত এগিয়ে চলেছেন।

ঐ আলো ধীরে ধীরে যেন নিকট হয়ে গেলো। একটা গুহার সামনে এসে তিনি চমকে গেলেন! এক শীর্ণকায় বৃদ্ধ ঐ গুহার ধারে একটা মশাল হাতে দাঁড়িয়ে আছেন। বৃদ্ধের গায়ে মাংস নেই বললেই চলে, চোখ দুটো কোটরাগত, সারা মাথায় ঝাঁকড়া চুল, একটা বীভৎস মূর্তি।

তাঁকে দেখেই তিনি বলে উঠলেন: আয়, কাছে আয়। আমি যে তোর

জন্য আজও বেঁচে আছি ; নইলে কবে এ দেহটা ত্যাগ করতাম। শোন, আমি এবার দেহত্যাগ করবো—এ আসনের ভার যে তোকে নিতে হবে। ঐ সব সাজ খুলে ফেলে এখুনি তোকে সন্ন্যাস দীক্ষা নিতে হবে।

পাহাড়ের গুহার ঐ সাধু একজন বৈদান্তিক আত্মজ্ঞানী মহাসাধক। এই মহাত্মার চরণতলে আশ্রয় গ্রহণ করে অধ্যাত্ম জগতের সমস্ত দ্বার যেন তাঁর সামনে খুলে যায়। তিনি নতুন জন্ম লাভ করলেন। ছিলেন হাবিলদার হলেন বৈদান্তিক সন্ন্যাসী।

সেদিনের ঐ হাবিলদারই আজ স্বামী সচ্চিদানন্দ সরস্বতী। জ্ঞানপন্থী তাপস।

লর্ড অকল্যাণ্ডের কথাই সত্য হলো। রহস্য উদ্ঘাটন করে সত্য সত্যই তিনি প্রমোশন পেলেন।

মানুষের জীবনে প্রমোশন আসে অনেক রকমে ; কিন্তু সৈনিক থেকে বৈদিক সন্ন্যাসীর প্রমোশন এ জগতে বড়ই দুর্লভ।

পূর্বজন্মের সুকৃতি না থাকলে কেউ সাধক হতে পারে না। সাধনা করে অনেকেই জন্ম জন্ম ধরে কিন্তু কোন্ জন্মে যে তাঁর সিদ্ধিলাভ হবে তা কি কেউ জানতে পারে!

ঈশ্বরজ্ঞান আসে চুপি চুপি. সাধকের অজান্তে—সাধন ভজন করতে করতে কখন যে তাঁর সারা দেহ-মন জ্যোতির্ময় রূপ ধরে তা সাধকও জানে না।

সাধনার লীলাক্ষেত্র এই ভারতবর্ষ, দেব-দেবতার পদধ্বনিতে এই ভারতের মাটি পবিত্র। তাই কালে কালে ভারতে সাধক আসছেন মুমূর্ষু মানুষের মনোবীণায় মুক্তির ঝংকার তুলতে।

নিগমানন্দ তীর্থভ্রমণে বের হবার বাসনা করলেন। সচ্চিদানন্দ তাঁকে নির্দেশ দিলেন তীর্থভ্রমণের।

নিগমানন্দ ভাবলেন যুগে যুগে সাধকরা তীর্থপথিক হয়েছেন। ভারতবর্ষের তীর্থে তীর্থে দেব-দেবতার লীলা হয়েছে, দেবভূমি ভারতবর্ষের পথে পথে দেব-দেবতার চরণরেণু পড়েছে। কুড়িয়ে বেড়াতে হবে সেই চরণরেণু। চির-তুষারের দেশ হিমালয় থেকে কন্যাকুমারিকা। এর মাঝে যা আছে তাঁকে সব দেখতে হবে। নিগমানন্দ গুরুর অনুমতি নিয়ে বের হবার সংকল্প করলেন।

সচ্চিদানন্দ তাঁর তীর্থপথের সাথী হলেন।

নিগমানন্দ যেন চঞ্চল হয়ে পড়েছেন—তাঁর মনে শুধু একই চিন্তা, জানতে হবে, দেখতে হবে, বুঝতে হবে। বাইরের আমি আর ভিতরের আমি একাকার করে ফেলে দেখতে হবে এই আমি কে! আত্মার আত্মীয় কে! আত্মার উপনিবেশই বা কোথায়! এ না জানতে পারলে জীবনের পথ-পরিক্রমা তাঁর সফল হবে না। সংসারে মানুষ যে জ্বালা যন্ত্রণা ভোগ করছে দিনের পর দিন, শোক তাপে কেনই বা জর্জরিত হচ্ছে? কোন্ পাপে? কার পাপে? এদের বাঁচানোর কোন্ মন্ত্র আছে?

নিগমানন্দ চলেছেন বদরিকাশ্রম। ভগবান শঙ্করাচার্য যাকে বলেছেন ত্যাগের ভূমি। এখান থেকে তুষারমৌলি হিমালয়ের চূড়া দেখা যায়। দেবাদিদেব মহাদেব ওখানে ঘর বেঁধেছেন। সংসার পেতেছেন সতীকে নিয়ে। সারা বিশ্ব যাঁর ঘর, তিনি বেঁধেছেন ঘর। যাঁর কোন অশন নেই বসন নেই, কামনা নেই, বাসনা নেই, তিনি কেমন করে ঘর বাঁধলেন?

নিগমানন্দ কত কি যে ভাবছেন তার কোন ইয়ত্তা নেই। ঘুরতে ঘুরতে মানস সরোবরে এলেন—এখানে এসে তাঁর চোখে যেন সব কিছু বিস্ময় লাগে। এত উঁচু পাহাড়ের ওপর এমন ধারা সরোবর কে সৃষ্টি করল!

হঠাৎ দেখলেন যেন সমস্ত সরোবর ফুলে ফুলে ভরে গেছে, আর সেই ফুলবনে অসংখ্য সুন্দরী মেয়ে খেলা করছে।

সচ্চিদানন্দ বললেন: আরে তুম্ কেয়া দেখ্‌তা হ্যায়।

নিগমানন্দ বললেন: ইয়ে আদমী সব কোন্, কাঁহাসে আয়া?

সচ্চিদানন্দ একটু হেসে বললেন: আরে বাপ রে, তুমহারা আঁখি তো একদম খুল গেয়া। সব ভি দেখ্‌নে সেক্‌তা হ্যায়। এইসা দিন তোমরা জরুর আয়েঙা যব তোম্ ভগবানকা সব কাম দেখেগা। তুম্ কোন্ হ্যায় বাবা?

: কেইসে বলেগা। আভিতক্ নেহি জানা হাম কৌন্ হ্যায়।

মানস সরোবর থেকে আবার তাঁরা নীচে নামলেন। চারদিক পাহাড় দিয়ে ঘেরা। কোথাও অরণ্যানী আবার কোথাও গাছপালা নেই, এরই ভিতর দিয়ে পথ বানিয়ে চলতে হয়।

সূর্য অস্ত যায় যায়। পশ্চিম দিকের পাহাড় একেবারে লালে লাল হয়ে গেছে। কোথাও মানুষের বসতি নেই। সূর্য ডুবে গেল পাহাড়ের

আড়ালে। পাতলা পাতলা অন্ধকার চারদিক ছেয়ে আসছে। নিগমানন্দ বললেন: আঁখসে হাম কুছ নেহি দেকতা।

সচ্চিদানন্দ পথ চলতে চলতে জবাব দিলেন: বেটা, আউর থোড়া চলো। কোই আশ্রয় মিল যায়েগা।

দুজনে অন্ধকারে পথ চলতে চলতে সন্ন্যাসিনী গৌরীমাতার আশ্রমে এলেন। হিমালয়ের নিরিবিলি ঘন অরণ্যের মাঝে এঁর আশ্রম। এত নিরিবিলি আর এত নির্জনতায় ঘেরা যে গাছের পাতা পড়লেও তা শোনা যায়।

গৌরীমাতার বয়স যে কত তা কেউ জানে না। সব সময়ই তাঁকে যুবতীর মত দেখায়। কেউ বলেন তাঁর বয়স যে কত হবে তা কেউ বলতে পারে না। কারও কারও অনুমান একশো, কারো অনুমান দেড়শো হবে। সচ্চিদানন্দ বলেন, তিনি তাঁকে বহুদিন থেকে একই ভাবে দেখছেন।

গৌরীমাতা বিশেষ কারও সঙ্গে দেখা করেন না। নিজের ঘরে একাই থাকেন ও সাধন ভজন করেন। তাঁর শিষ্যরা সব আলাদা থাকেন।

নিগমানন্দ দেখলেন গৌরীমাতাকে। গৌরীমাতাও তাঁর দিকে চেয়ে রইলেন। মনে হলো যেন তিনি নিগমানন্দকে বহুকাল থেকেই চেনেন। শুধু সচ্চিদানন্দের দিকে চেয়ে বললেন: তোমার এ শিষ্যকে পরে একবার আমার কাছে পাঠিয়ে দিও।

সচ্চিদানন্দ গৌরীমাতার দিকে চেয়ে বললেন: কাহে।

: ও যখন নির্বিকল্পে পৌছাবে তখন ও যেন আমার কাছে আসে।

নিগমানন্দ শুনলেন এ কথা। মনে মনে ভাবলেন, কোথায় যে তিনি পৌছেছেন তাও তিনি জানেন না, আবার কোথায় যে তিনি পৌছাবেন তাও তিনি জানেন না।

সচ্চিদানন্দ এবার তাঁকে একা একাই তীর্থভ্রমণে যেতে নির্দেশ দিয়ে নিজে পুষ্করের আশ্রমে ফিরে গেলেন।

নিগমানন্দ চললেন দ্বারকার পথে।

এতদিন সচ্চিদানন্দ ছিলেন, এবার তিনি সম্পূর্ণ একা। কোনদিন তিনি এ পথে আসেন নি—পথ-ঘাটও কিছু তাঁর জানা নেই। কিন্তু উপায় কি! পথে যখন তিনি বেরিয়েছেন পথের শেষ তাঁকে দেখতেই হবে।

তিনি সন্ন্যাসী। আমিত্বের বিনাশ না ঘটালে সন্ন্যাসী হওয়া যায় না।

আমি কার, কে আমি, কার জন্য আমি, এ বোধশক্তি যখন কারও আসে তখন তাকে ঘরে আটকে রাখে কার সাধ্য। ঘর তখন পর হয়, অন্য ঘরের সন্ধানে তখন তাকে বের হতে হয়—যে ঘরে গেলে সব দেখা যায়, সব জানা যায়, সব বোঝা যায়।

তাই তো নিগমানন্দ আজ পথিক।

এক ঘর ভেঙে আজ চলেছেন আর এক ঘরের সন্ধানে। সেই ঘরে আশ্রয় পেলেই জীবনের পাকা আশ্রয় মিলে যাবে। আর আশ্রয় খুঁজতে হবে না।

॥ ১৩ ॥

ভগবান শ্রীকৃষ্ণের লীলাক্ষেত্র দ্বারকা। নবরূপে এখানে যত লীলা তিনি করেছেন ভারতবর্ষের আর কোথাও এমনি ধারা প্রকট লীলা তিনি করেন নি। মথুরার প্রেম দ্বারকায় এসে ফুল হয়ে ফুটেছে।

এখানে শংকর প্রতিষ্ঠিত সারদা মঠে এসে উপস্থিত হলেন নিগমানন্দ। এ আশ্রমে কোন মোহান্ত নেই—এক বৃদ্ধা সন্ন্যাসিনীই এই আশ্রমের কর্ত্রী।

'তত্ত্বমসি' এই আশ্রমের মূল মন্ত্র।

তিনিই তো আমি, আমিই তো তিনি, আমার মাঝেই তাঁর প্রকাশ, তাঁর রূপই আমার রূপ—এই ভাবই এখানে সবার মনে। এই ভাবের ধারক বাহক হয়েই এই আশ্রমের সকলের জীবনযাত্রা।

বৃদ্ধা নিগমানন্দকে আপন করে নিলেন। ঠিক যেন নিজের আত্মার আত্মীয়। স্নেহের নিগড়ে তিনি তাঁকে বেঁধে ফেললেন। নিগমানন্দ যেন ফিরে পেলেন তাঁর হারানো মাকে তাঁর মধ্যে।

বৃদ্ধা নিগমানন্দকে আশ্রম-মোহান্ত পদে ভূষিত করলেন।

ঠিক এমনি সময়ে এক যুবতী ভৈরবীর আবির্ভাব হলো সারদা মঠে। তিনি দেখতে যেমন অপরূপ সুন্দরী তেমনি সর্বশাস্ত্রে অভিজ্ঞা। এই অল্প বয়সে এতখানি শাস্ত্রজ্ঞা কি করে হলেন তিনি তা দেখে সত্যিই বিস্মিত হতে হয়।

ভৈরবীর পূর্ব নিবাস যশোহর জেলার কোন এক গ্রামে। তিনি এক সদ্‌গুণ-সম্পন্না ব্রাহ্মণকন্যা। জীবনের জিজ্ঞাসায় ক্লান্ত হয়ে তিনি শেষে এই পথই বেছে নিয়েছেন।

নিগমানন্দর কাছে তিনি ঘন ঘন আসা যাওয়া শুরু করলেন। ভৈরবীর মন আকৃষ্ট হলো নিগমানন্দের দিকে।

নিগমানন্দও চঞ্চল হলেন।

তিনিও যেমন অল্পবয়স্ক সুপুরুষ, ভৈরবীও তেমনি সুন্দরী। জীবনই দেউলিয়া হয়েছে, তাঁর যৌবন তো দেউলিয়া হয় নি। যৌবনের ধর্ম পালন করার মাঝে তো কোন পাপ নেই। যৌবনকে বাঁধ দিয়ে বেঁধে রেখে জীবন

চলতে পারে না সুষ্ঠুভাবে। তাই একদিন ভৈরবী নিগমানন্দের কাছে শৈববিবাহের প্রস্তাব করলেন।

নিগমানন্দও সানন্দে মত দিলেন।

সাধক জীবনের সামনে কত যে কণ্টক মুহূর্ত আসে তা কে জানে! তিনি ভাবলেন—মন্দ কি? একাধারে মঠের মোহান্ত হলেন আবার বিবাহ করে ধর্মাচরণ করবেন।

বিবাহ তো শুধু জীবনে জীবনে বিদ্রোহ নয়। সাধন-পথেও এর মূল্য আছে। তা ছাড়া জীবন্মুক্ত যে, তার কোন অপরাধ হয় না। কোন বন্ধন-ভয়ও নেই। আত্মজ্ঞান যে একবার লাভ করেছে তার কোন রকমেই অধঃপতন হতে পারে না।

আত্মজ্ঞানী পুরুষ নিগমানন্দ ভাবলেন—কাঠ যদি একবার জ্বলে ওঠে তবে তা জ্বলতেই থাকবে; সে আগুনকে আর কোন ভাবেই কাঠের ভিতর প্রবেশ করাতে পারা যায় না। দুধের সঙ্গে মাখন থাকে কিন্তু সেই দুধ মন্থন করে যখন বার করা হয় তখন সে আর দুধের সঙ্গে কিছুতেই মিশবে না।

ভৈরবীর সাথে নিগমানন্দের শৈববিবাহের দিন ঠিক হয়ে গেলো। বিয়ের আগের দিন রাতে নিগমানন্দ স্বপ্নে দেখলেন—বিবাহলগ্ন সমাগত। নববধূ অপূর্ব সাজে সেজে বসে আছে। গলায় হাতে বনফুলের মালা, কপালে চন্দনের টিপ, সারা মুখমণ্ডলে চন্দনের কারুকার্য, কালো চোখের তারায় কাজলের রেখা, রক্ত-রাঙা ঠোঁটে কুমকুমের পরশ, আলতা-রাঙা পায়ে আবীরের ছটা। নববধূর মুখে যেন পূর্ণিমার চাঁদ উঠেছে।

নিগমানন্দ ভৈরবীকে কাছে টানতে যাবেন এমন সময় কানে এলো গুরুদেব সচ্চিদানন্দের সাড়ে চার সের ওজনের চিমটার ঝনঝন শব্দ। অকস্মাৎ তিনি অবাক্ বিস্ময়ে দেখতে পেলেন নববধূর সমস্ত দেহ যেন মাখনের মত গলে গলে পড়ছে। দেখতে দেখতে সমস্ত দেহ থেকে মাংসপিণ্ড খসে গিয়ে কংকাল দেখা গেলো।

এ কি! এ যে একটা নরকংকাল! এ কে, এ কি সেই ভৈরবী! কংকালটা দুই হাত দিয়ে নিগমানন্দকে জড়িয়ে ধরতে চাইলো। নিগমানন্দ ভয়ে চিৎকার করে সেই মুহূর্তেই ঘর থেকে বের হয়ে পড়লেন। আশ্রমের দ্বারে বৃদ্ধা সন্ন্যাসিনী তাঁর পথ রোধ করে দাঁড়ালেন। তিনি তাঁকে ঠেলে ফেলে দিয়ে ঊর্ধ্বশ্বাসে সামনের দিকে ছুটতে লাগলেন।

নিগমানন্দ ভাবলেন—সদ্‌গুরু এমনি ভাবেই স্বপ্নের ভিতর দিয়ে শিষ্যকে পথ দেখান।

নিগমানন্দ চলেছেন পথ বেয়ে।

সর্বাঙ্গ দিয়ে তাঁর স্রোতের মত ঘামের বন্যা বয়ে চলেছে। ভাবছেন তিনি মানুষের কথা। এই মানুষের দেহের শেষ রূপ। ফল-ফুলে শোভিত গাছ একদিন তার সব পাতা শাখা ঝরিয়ে দিয়ে কংকালে পরিণত হয়। মানুষের দেহের কি পরিণাম! যৌবনের ভরা নদী একদিন শুকিয়ে যায়। সৌন্দর্যভরা মুখের হয় বিকৃত রূপ, অপরূপ রূপলাবণ্য একদিন চোখের জলে বিদায় নেয়; তারপর যা হয় তিনি প্রত্যক্ষ করেছেন। এর জন্য মানুষের কত অভিনয়! অনিত্য বস্তুর প্রতি এই যে মিথ্যা আকর্ষণ, এই যে নিষ্ফল প্রহসন, এর হাত থেকে মুক্তি না পেলে মানুষেরও মুক্তি নেই।

চিরকাল মানুষকে তাই ঘুরে বেড়াতে হচ্ছে অন্ধকার থেকে আরও অন্ধকারে। মৃত্যুর এক পার থেকে আর এক পারে। আলো আলো করে পথ না পেয়ে তাই মানুষের হচ্ছে নিত্য-মরণ। বার বার তিনি পথ চলতে চলতে গুরুদেবের উদ্দেশ্যে প্রণাম জানান।

পথ দেখাতে হবে বিশ্বের মানুষকে, আশ্রয়ের সন্ধানে মানুষকে অমৃতের পথে নিয়ে যেতে হবে। সেই অমৃত-পথ-যাত্রীদের বোঝাতে হবে যে, আমরা ঈশ্বরের পুত্র। তোমাতে আমাতে ঈশ্বরের অস্তিত্ব। এ জীবন বৃথা মৃত্যুর পথে নিয়ে যাওয়া চলবে না। এ জগতে সবই তিনি। সবতাতেই তিনি। তবে আমার ভয় কি!

ঈশ্বরকে সাথে নিয়েই তো আমার পথ-পরিক্রমা। এ পথ তো অমৃতের পথ।

॥ ১৪ ॥

ঘুরতে ঘুরতে আবার তিনি পুষ্করে এসে গুরু সচ্চিদানন্দর আশ্রমে উঠলেন। সচ্চিদানন্দ তাঁকে বুকে তুলে নিয়ে বললেন : তোর ভুল পথে চলার তো কোন উপায় নেই। দেখলি তো মানুষের কি শেষ পরিণাম। তুই হচ্ছিস নিগমের সাধক ; তোর তো পিছনের দিকে ফিরে যাওয়ার কোন উপায় নেই।

নিগমানন্দ আর কোন কথা বলেন না। তিনি শুধু গুরুদেবের দিকে তাকিয়ে থাকেন।

গুরুদেব বলেন : আমার ঝুলি শূন্য। তোকে যা দেবার দিয়ে দিয়েছি। এবার তোকে যোগীগুরুর সন্ধানে বের হতে হবে।

নিগমানন্দের চোখে জল এলো। এমন গুরুকে তিনি ছাড়তে চান না। তাঁর বুক যেন ভেঙে যায়। বলেন : আমি কি করে তাঁকে পাবো, কোথায় তিনি আছেন ?

সচ্চিদানন্দ হাসেন : তুই কি ভাবিস তোকেই শুধু খুঁজতে হবে ? ওরে, তিনিও যে তোকে খুঁজছেন ! পরে বলেন একটু থেমে : সংসারবদ্ধ জীবের কি অসার ধারণা ; ভাবে, ঈশ্বরকে পাবার জন্য বুঝি তাদের শুধু ডেকেই যেতে হয় ! ঈশ্বরও যে অবিরাম সবাইকে ডাকছেন তা কি কেউ জানে, না বোঝে ? দরকার শুধু মানুষেরই নয়, দরকার ঈশ্বরেরও। দুনিয়ার বোকা মানুষের কি কাণ্ড দেখ, কেউ ঈশ্বরকে পাবার জন্য ছুটছে তীর্থে, কেউ ছুটে চলেছে মন্দিরে, কেউ ছুটেছে পাহাড়ে পর্বতে, কেউ বা ছুটে চলেছে সাধু-সন্তর কাছে। হ্যাঁরে, ঈশ্বর কি গরু না ছাগল, যে মানুষ এমন করে অবিরাম খুঁজে বেড়াচ্ছে ! ঈশ্বর কখনও হারায় না। যা কখনও হারায় নি, যা কখনও হারাতে পারে না, তাঁরই খোঁজে সবাই ঘুরে বেড়াচ্ছে। ওরে বেকুব, হারালোই বা কবে আর তোরা খুঁজেই বা বেড়াচ্ছিস কেন ! তুই কিছু ভাবিস নে, যোগীগুরু ঠিক তোর মিলে যাবে।

নিগমানন্দ আবার পথে এসে দাঁড়ালেন। যোগীগুরুর সন্ধান তাঁকে করতে হবে, আধ্যাত্মিক জগতের সব দোর তাঁকে খুলতে হবে।

কত বনপথ, পাহাড় পর্বত, ঘন অরণ্যানীর ভিতর দিয়ে তিনি চলেছেন।

দেহের প্রতি তাঁর যেন কোন ভ্রুক্ষেপ নেই। কাঁটার আঁচড়ে তাঁর পা কেটে যাচ্ছে, পাথরে হোঁচট লেগে আঘাত লাগছে, ক্ষুধা তৃষ্ণা মেটাবার কোন উপায় নেই। বর্ষার জল তাঁকে বার বার স্নান করিয়ে দিচ্ছে, আবার রৌদ্র এসে তাঁর গায়ের জল শুকিয়ে দিচ্ছে।

কোন লক্ষ্য নেই। এ দেহ তাঁর কি প্রয়োজনে লাগবে যদি তাঁর বাঞ্ছিত জিনিস না মেলে? কি হবে এই রক্ত-মাংসের অনিত্য শরীর যদি তা নিত্য বস্তুর সন্ধান না পায়? যিনি তাঁকে এ পৃথিবীতে এনেছেন তাঁকেই যদি না দেখা গেলো, না পাওয়া গেলো, তবে জীবন থাকলো আর গেলো, তাতে কি আসে যায়!

চলেছেন নিগমানন্দ রাজপুতানার এক গভীর বনানীর ভিতর দিয়ে। বেলা যে শেষ হয়ে গেলো। ঐ তো সূর্যদেব পাহাড়ের ওপারে অস্ত যাচ্ছেন। সন্ধ্যা এলো তার কালো আঁচল বিছিয়ে।

এ অন্ধকারে কোথায় তিনি যাবেন! কোন্‌খানে তাঁর আশ্রয় মিলবে! এ বনে যদি কোন হিংস্র জন্তু থাকে তাহলে তাঁকে খেয়েও ফেলতে পারে। নিগমানন্দ ক্লান্ত হয়ে এক গাছের তলায় বসলেন। ভাবলেন, যা হয় হোক, আর তাঁর শক্তি নেই। যে কোন বিপদ আসুক, তিনি তা অম্লান বদনে আলিঙ্গন করবেন।

দেবদারুর মত উঁচু লম্বা গাছের ফাঁক দিয়ে নক্ষত্ররাজি দেখা যাচ্ছে। কোন্‌ তিথি কে জানে। বনের ভিতরও গভীর অন্ধকার। এখানে বোধ হয় মানুষের কোন বসতি নেই।

নিগমানন্দ গাছে হেলান দিয়ে আছেন। সারা দেহ ক্লান্তিতে অবসন্ন। একটু তন্দ্রা আসছে। এমন সময় শুনতে পেলেন, কে যেন তাঁকে নাম ধরে ডাকছে! এই গভীর বনের মধ্যে কে তাঁর নাম ধরে ডাকে? তিনি বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে পড়লেন।

হঠাৎ সামনে এক নারীমূর্তি দেখে তিনি চমকে ওঠে দাঁড়ান: এ কি, ইনি কে! একে তো কোনদিন দেখি নি! এই বনের ভিতর কে এই রহস্যময়ী পথচারিণী?

তিনি বললেন: তুমি এইভাবে অন্ধকারে কেন বসে আছো? ওঠো, আর একটু কষ্ট করো, সামনের পথটা দিয়ে কিছুদূর চলে যাও, সেখানে একটা আশ্রম আছে। আজকের রাত সেখানেই বিশ্রাম করে প্রভাত হলে আবার যাত্রা শুরু করো।

অন্ধকারে কোন মতে টলতে টলতে আবার চলা শুরু করলেন নিগমানন্দ। কিছুক্ষণ পর বনের মধ্যে একটা ক্ষীণ আলো দেখতে পেয়ে এগিয়ে গিয়ে দেখলেন সত্যই একটা কুটির। কুটিরের একফালি বারান্দার ওপর ধ্যানরতা এক রমণী।

নিগমানন্দ কিছু দূরে গিয়ে বসে পড়লেন। আশপাশে আর কেউ নেই। কোন সাড়াশব্দও কোথাও নেই। তবে কি এই বিপদসংকুল বনের ভিতর তিনি একাকী সাধনা করছেন! পরে তিনি জানতে পারলেন—ইনি এক যোগসিদ্ধা সাধিকা।

অনেকক্ষণ পরে সাধিকার ধ্যান ভঙ্গ হলো।

নিগমানন্দ বললেন : আমি……

উত্তর হলো : হ্যাঁ আমি জানি। ওপাশের ঘরে তোমার জন্য খাবার আছে। আগে খেয়ে সুস্থ হয়ে বিশ্রাম করো।

নিগমানন্দ আর কোন কথা না বলে তাঁর নির্দেশ পালন করলেন ও ধীরে ধীরে গভীর নিদ্রায় অচেতন হলেন।

রাত পোহালো কি একটা পাখির বিকট চিৎকারে। নিগমানন্দ উঠে দেখলেন তাঁর শরীরে যেন আর কোন ক্লান্তিই নেই। সূর্যের আলোয় আশ্রম প্রাঙ্গণ প্লাবিত। আশ্রমের চারপাশে অসংখ্য রং-বেরঙের ফুলের গাছ। নিগমানন্দ এ সব ফুল কোনদিন দেখেনই নি।

আশ্রম সাধিকা এবার তাঁর সামনে এলেন।

নিগমানন্দ দেখলেন সাধিকাকে। ইনি কে? এখানে কেন আছেন তা জিজ্ঞাসা করবার আগেই সাধিকার কণ্ঠস্বর শোনা গেলো : তুমি আর বনে বনে ঘুরো না। কলকাতায় চলে যাও। তোমার যোগীগুরু তোমার পথ চেয়ে বসে আছেন।

নিগমানন্দ বললেন : কোথায় তাঁর দর্শন পাবো।

: ঠিক জায়গায় তিনি আছেন ও ঠিক জায়গায় তুমি তাড়াতাড়িই পৌঁছে যাবে।

: আপনি কি করে জানলেন এ সব কথা।

একটু হেসে তিনি বললেন : এ কথা আমার নয়। যিনি আমাকে বলাচ্ছেন এ তাঁরই কথা ; সুতরাং এ মিথ্যে হবার নয়।

: কিন্তু আমি যাবো কি করে?

: টাকা-পয়সার কথা ভাবছো! তিনিই দেবেন—

নিগমানন্দ আবার পথ চলা শুরু করলেন। এবার সঙ্গে আছেন সেই সাধিকা। পথ চলতে চলতে হঠাৎ এক জায়গায় থেমে তিনি বললেন: এবার তুমি যাও। ঐ যে বন ওরই ওধারে রেলস্টেশন। এই নাও তোমার খরচ।

নিগমানন্দ হাত পেতে নিলেন—দেখলেন একগোছা নোট।

হঠাৎ পেছন ফিরে দেখলেন সে সাধিকা নেই। এক নিমিষে তিনি কোথায় অন্তর্হিত হলেন? নিগমানন্দ বড় হতাশ হয়ে পড়লেন। এমন যোগসিদ্ধা সাধিকাকে হাতে পেয়ে ছেড়ে দিলেন! ছুটলেন নিগমানন্দ আবার বনের ভিতর দিয়ে।

এ কি! কোথায় গেলো সেই আশ্রম আর কোথায় বা গেলো সেই সাধিকা।

নিগমানন্দ ফিরে এলেন স্টেশনে।

ট্রেন আসতে দেরি দেখে তিনি একটা বেঞ্চির ওপর বসে পড়লেন। ভাবছেন—কোন্ যাদু-মন্ত্রবলে এ সব ঘটনা তাঁর সামনে ঘটছে? সাধিকা বললেন যে কথা, তিনি বললেন তা তাঁর কথা নয়! তবে কার কথা!

নিগমানন্দ ভাবলেন—সাধক জীবনে বার বার শক্তি সম্বন্ধে না জানলে কোন কাজই হয় না। কারণ ইচ্ছাশক্তিই হচ্ছে জগতের মূল। এই ইচ্ছাশক্তি থেকেই জীবজগৎ সৃষ্টি। তিনি বহু হবেন ইচ্ছে করলে বহু হতে পারেন। এই ইচ্ছাশক্তির বলে সব কিছু সম্ভব হতে পারে। সাধক-সাধিকার এই যে শক্তি এ তাঁরই ইচ্ছাশক্তি। যদি কোন আত্মজ্ঞানী সাধক সমস্ত মন প্রাণ দিয়ে ইচ্ছা করেন যে একটা অসাধ্য সাধন করতে হবে, তা হবেই। সব কিছুর মূলে ঐ একই তত্ত্ব—ইচ্ছাশক্তি। মন্ত্রশক্তি আর তন্ত্রশক্তি সবই সেই ইচ্ছাশক্তির ক্রিয়া। বিজ্ঞান বিজ্ঞান করে মানুষ বড়াই করছে। বিজ্ঞান আবিষ্কার করছে কিন্তু পিছনে রয়েছে সেই সাধক বিজ্ঞানীর ইচ্ছাশক্তি।

স্টেশন কাঁপিয়ে ট্রেন এসে পড়লো। তাড়াতাড়ি টিকিট কেটে তিনি উঠে পড়লেন।

॥ ১৫ ॥

নিগমানন্দ কলকাতায় এলেন। এ জনারণ্যে কোথায় তিনি তাঁর যোগীগুরুর সন্ধান পাবেন! তিনি মনে মনে ঠিক করলেন যে আপন মনে ভবঘুরের মত তিনি ঘুরে বেড়াবেন। গুরুদেব যদি তাঁর জন্য বসে থাকেন তাহলে ঠিকই একদিন দেখা পাবেন। গুরু যদি নিজে না ধরা দেন তাহলে তিনি তাঁকে কোনদিনই ধরতে পারবেন না।

কলকাতায় থাকাকালীন তিনি শুনতে পান যে ডাঃ অ্যানী বেসান্ত কৃষ্ণনগর যাবেন পরলোক সম্বন্ধে বক্তৃতা দেওয়ার জন্য। তিনিও সেই বক্তৃতা শোনবার জন্য কৃষ্ণনগর গেলেন। কিন্তু অ্যানী বেসান্তের বক্তৃতার সাথে তিনি একমত হতে না পারায় ফিরে এলেন আবার কলকাতায়। অ্যানী বেসান্ত বলেছেন যে, মৃত্যুর পর প্রত্যেক মানুষই জীবিত অবস্থায় যা যা ঘটেছিল তা মনে রাখে, এ কখনই সম্ভব নয়। প্রত্যেক ঘটনা যদি মনে থাকতো তাহলে কারও পুনর্জন্ম হতো না। প্রবল আসক্তির জন্যই তো বার বার মানুষের এ দুনিয়ায় আসা। কামনা বাসনা কারও একজন্মে শেষ হয় না; তাই এই আসা যাওয়া। বিষয় ঐশ্বর্যে যার মোহ তাকে আবার জন্ম নিতেই হবে। যে সৎ, যে সারাজীবন ঈশ্বর-চর্চা করেছে তাঁকে লাভ করবার জন্য, যে ভেবেছে কেঁদেছে তাকেই শুধু আর আসতে হয় না। ঈশ্বরের কৃপালাভে সে বঞ্চিত হয় না। কখন যে কার ওপর ঈশ্বরের কৃপা হবে তা কেউ বলতে পারে না।

নিগমানন্দ বৈদান্তিক সন্ন্যাসী। মানুষের জীবনবেদ তাঁর অজানা নেই। তবুও এই মানুষের কি প্রবল আস্ফালন। আমি এই কাজটা করলাম, এই কঠিন কাজ আমি ছাড়া আর কেউ করতে পারতো না। আমি জল সেচলাম, সাগর বাঁধলাম। আমিই তো সব করলাম। মূর্খ মানুষের কি বাচালতা! অথচ জানো না, তোমার সাধ্য কি যে তুমি সব করবে? তুমি ধরে আছ তোমার অহংকারকে আর ঈশ্বর ধরে আছেন তোমাকে। এখন অহংকারের আবরণে তুমি ঢেকে আছ কিন্তু যেদিন সব ফেলে তোমাকে চলে যেতে হবে সেদিন মনে পড়বে, কে তোমার মধ্যে 'আমি' হয়ে সব কাজ করেছিল।

কলকাতা নিগমানন্দের ভালো লাগছে না। এত মানুষের কোলাহলে কি মনকে এক জায়গায় দাঁড় করিয়ে রাখা যায়! তিনি কামাক্ষ্যার পথে রওনা হলেন। কামাক্ষ্যায় তখন অম্বুবাচীর ভিড়। এ ভিড়েও তিনি যেন হাঁপিয়ে উঠলেন। সেখান থেকে রওনা হলেন পরশুরাম তীর্থে।

কিন্তু মন তাঁর কোন জায়গায় বসে না। তিনি পাহাড়ী অঞ্চলের ভিতর দিয়ে একাকী চলতে লাগলেন। কখনও পাহাড়ের চড়াই উতরাই পার হচ্ছেন, কখনও বনের ভিতর দিয়ে চলেছেন। চলেছেন তো চলেছেনই; কোনদিকে তাঁর দৃষ্টি নেই। শুধু একই চিন্তা মনে। কতদিন হয়ে গেলো, কই, তিনি তো যোগীগুরুর সন্ধান পেলেন না!

দেখতে দেখতে সন্ধ্যে হয়ে এলো। এ শ্বাপদসংকুল বিপদের বেড়াজাল ডিঙিয়ে তিনি কোথায় এখন যাবেন! দেখতে দেখতে চারদিক অন্ধকারে ভরে এলো। নিগমানন্দ এই অন্ধকারের ভিতর একটা গাছের ওপর উঠে বসলেন। গাছের ওপর বসে বসে তিনি ভাবছেন—

"ভগবানকে মংগলময় না বলে কোন উপায় নেই। যতই বিপদ আসুক না কেন, যতই দুঃখে কষ্টে কালাতিপাত করো না কেন, দুঃখ-কষ্টের জন্য ভগবানের ওপর যতই দোষারোপ করো না কেন, বাইরে যতই তাঁর বিরুদ্ধাচরণ করো না কেন, শেষ পর্যন্ত যখন অবসন্ন হয়ে পড়বে তখন তাঁকে আশ্রয় করতেই হবে। সন্তানকে যতই মারো ধরো না কেন সে 'মা' 'মা' বলে মায়ের কোলে কাঁদতে কাঁদতে তারই কোলে ঝাঁপিয়ে পড়বে।"

নিগমানন্দর সারারাত জেগে কেটে গেলো ঐ গাছের ওপর। ভগবানই অলক্ষ্যে তাঁকে পাহারা দিয়েছেন। তখন সবে মাত্র ভোর হয়েছে। চারদিকে বেশ ফর্সা হয়ে গেছে। পুবদিকটা ধীরে ধীরে লাল হয়ে আসছে। তিনি গাছের ওপর থেকে দেখলেন ঠিক সেই গাছটার তলায় একজন সন্ন্যাসী শুকনো পাতা, গাছের ডাল একত্র করে ধূনী জ্বালিয়ে বসে আছেন। সামনে একটা গাঁজার কলকে পড়ে আছে। নিগমানন্দ আশ্চর্য হয়ে গেলেন। যখন তিনি গাছে উঠেছিলেন তখন তো কেউ ছিল না! হঠাৎ এই রাতের অন্ধকারে এ সন্ন্যাসী কোথা থেকে এলো!

ভয়ে বিস্ময়ে তাঁর অন্তরাত্মা যেন কেঁপে উঠলো। একবার নীচের দিকে তাকান আর একবার গাছের ডালপালা নাড়েন। সন্ন্যাসী তখন গাঁজা টানতে

শুরু করেছেন। নিগমানন্দ সাহসে ভর করে গাছ থেকে নেমে এলেন। ভয় সম্পূর্ণই তাঁর সারা চোখে মুখে বিদ্যমান।

তিনি যে সন্ন্যাসীর সামনে দাঁড়িয়ে আছেন তাও সন্ন্যাসীর খেয়াল নেই। গাঁজার কলকেটা তিনি নিগমানন্দের দিকে হাত বাড়িয়ে দিলেন।

নিগমানন্দ ভয়ে ভয়ে কলকেতে দুটো টান দিয়ে আবার সন্ন্যাসীকে ফিরিয়ে দিলেন।

সন্ন্যাসী কলকেটা হাতে নিয়ে শুধু বললেন : এসো আমার সঙ্গে।

নিগমানন্দ নীরবে সন্ন্যাসীর পিছন পিছন যেতে লাগলেন।

পথ চলছেন দুজন।

বনের মধ্য দিয়ে সরু এক পায়ে চলার পথ। এ পথে যে কোন লোক চলে তা এ পথ দেখলে বোঝা যায় না।

কিছু দূর গিয়ে পাহাড়ের সামনে দাঁড়িয়ে পড়লেন।

সন্ন্যাসীর অপূর্ব চেহারা, সুদর্শন স্বাস্থ্য, বড় বড় চোখে কালো ভ্রু, সারা কপালময় চন্দন লেপা, মাঝে একটা লাল টিপ। মাথায় বড় বড় চুল। হঠাৎ দেখলে কোন কাপালিকের মত মনে হয়।

নিগমানন্দ আনন্দে আত্মহারা হয়ে গিয়ে তাঁর চরণে লুটিয়ে পড়লেন।

সন্ন্যাসী একটু হেসে তাঁকে ধরে তুলে বললেন : আমি জানি তুমি কে, কি জন্য তুমি বনে বনে ঘুরে বেড়াচ্ছো। তোমার তো কোন অভাব নেই। যে বাসনা নিয়ে তুমি ঘুরে বেড়াচ্ছো তা আমি সব পূরণ করবো। তুমি আজ আসবে তা আমি জানতে পেরে তোমাকে এগিয়ে আনতে ঐ গাছতলায় গিয়েছিলাম।

এই সন্ন্যাসী আর কেউ নয়। ইনি নিগমানন্দের যোগীগুরু সুমেরদাস মহারাজ। এঁরই সন্ধানে নিগমানন্দের চোখে ঘুম নেই, কোনখানে এক ভাবে থাকতে পারছিলেন না। একেই বলে গুরুকৃপা। তিনিই শুধু খুঁজছেন না, খুঁজছেন তাঁর গুরুও।

সন্ন্যাসী বললেন : তোমার আর কোন ভাবনা নেই, সবই আমি তোমায় দেবো।

এই বলে তিনি একটা পাথর ঠেলতেই একটা গহ্বর দেখা গেলো। তার ভিতর দুটো ঘর। একটা ঘরে সন্ন্যাসীর সাধন ভজন হয় আর একটা ঘরে সাজানো রয়েছে হাজারো রকমের তালপাতার পুঁথি।

সন্ন্যাসী বললেন : কি দেখছো।

: পুঁথি।

: হ্যাঁ, ওটা হচ্ছে জ্ঞান প্রকোষ্ঠ, আর একটা হচ্ছে তারই পরীক্ষা দেবার ঘর। ঐ যে পুঁথি সব দেখছো, ওগুলো শুধু তালপাতা নয়। ওগুলো জীবনের এক একটা পাতা। ঐ পাতা উলটাতে উলটাতেই মহাজীবনের সন্ধান পাওয়া যাবে।

নিগমানন্দ ঘুরে ঘুরে সব দেখছেন।

পাহাড়ের এই গহ্বরে যে এমন মণিমুক্তা থাকতে পারে তা তাঁর ধারণার বাইরে।

নিগমানন্দ ধীরে ধীরে সমস্ত পুঁথি পড়ে ফেললেন।

এ পুঁথিগুলোর ভিতরে যেন সারা ভারতবর্ষের সমস্ত সাধনার পথ দেখানো আছে। দেহতত্ত্ব থেকে শুরু করে সমস্ত তত্ত্বই নিহিত আছে এর মধ্যে।

সুমেরদাস মহারাজ সাধনার সমস্ত প্রক্রিয়াগুলি নিগমানন্দকে শিখিয়ে দিলেন। তিনিও সমস্ত কিছু করায়ত্ত করে ফেললেন। নিগমানন্দের অন্তরের সমস্ত নয়ন বুঝি খুলে গেল। তিনি বর্তমান ভূত ভবিষ্যৎ সব কিছু চাক্ষুষ করলেন।

যোগীগুরু নিগমানন্দকে তাঁর গত জন্মের কথা সব বলে গেলেন। বর্তমান জীবন ও ভবিষ্যৎ জীবনের কথাও তিনি তাঁকে সব শুনিয়ে দিলেন।

নিগমানন্দ মনে মনে ঠিক করলেন, এবার দেহত্যাগ করলে আর তিনি জন্মগ্রহণ করবেন না। জন্ম ও মৃত্যুর কারাগার থেকে তিনি মুক্তি পেতে চান চিরতরে। বার বার আসা যাওয়ার খেলা তিনি আর চান না।

প্রতিদিন সুমেরদাস তাঁকে পাহাড়ে বেড়াতে নিয়ে যেতেন। কথার পর কথামালা গেঁথে নানা কথা তিনি শোনাতেন তাঁকে। অজ্ঞাতবাসে থেকেও সুমেরদাস বুঝি সারা দুনিয়ার সংবাদই রাখতেন। প্রকৃত যোগী পুরুষ সমস্ত জগতের খবরই জানেন।

সুমেরদাস বলেন : মানুষের ভিতর সমস্ত শক্তি রয়েছে। যে তাকে জাগাতে পারে সে সারা দুনিয়াকে নিজের বশে রাখতে পারে। এই শক্তি সঞ্চয়ের জন্যই তো সাধনা।

নিগমানন্দ মনের আনন্দে তাঁর কথানুযায়ী কাজ করে তাঁর কাছ থেকে সমস্ত কিছু নিয়ে নিলেন।

কয়েকদিন পর সুমেরদাস তাঁকে বললেন : এবার তোকে যেতে হবে লোকালয়ে ; রাজযোগ সাধনা করতে।

বেদান্ত চর্চায় এত বেশী জ্ঞানার্জন করলেন যে নির্বিকল্পে পৌছানোর পথ তাঁর সামনে পরিষ্কার হয়ে গেলো।

সুমেরদাসজী তাকে ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে সব কিছু জানিয়ে দিয়ে আবার বাংলায় ফিরে যেতে বললেন।

তিনি পরিব্রাজকের মত ঘুরতে ঘুরতে এলেন মেদিনীপুরের তমলুক মহকুমার হরিপুর গ্রামে। রাত্রিকালে কোথায় বা তিনি আশ্রয় ভিক্ষা করবেন ! আর সম্পূর্ণ অজানা অচেনা একজনকে কেই বা আশ্রয় দেবে ?

তিনি রাতে হরিপুরের এক মন্দিরে আশ্রয় গ্রহণ করলেন। দীর্ঘদিনের পথশ্রম তাঁর পক্ষে কষ্টকরই মনে হলো। পা দুটো যেন আর নড়তেই চায় না। তা হোক, একে তিনি মেনেই নিয়েছেন। দৈহিক সুখের জন্য তিনি তো ঘর থেকে বেরোন নি। এ দেহের যত্ন নিয়ে কি হবে ! যে জন্য দেহ ধারণ করা, যে জন্য দেহ টেনে নিয়ে বেড়ানো, যে জন্য দেহ, সেই পরম করুণাময়কে জানতে পারলেই হলো। দেহধারী মানুষ হয়ে যদি সৃষ্টিকর্তাকে না জানতে পারা গেলো তবে মৃত্যুর পর গৃধিনী শৃগালে সে দেহ স্পর্শ করবে না।

নিগমানন্দ সেই মন্দিরেই ঘুমিয়ে পড়লেন।

॥ ১৬ ॥

রাত তখন শেষ হয় হয়। নিগমানন্দ গভীর ঘুমে অচেতন। পাখির কাকলীতেও তাঁর ঘুম যেন ভাঙছে না। পাখিরা ফিরে গেলো, সূর্য উঠলো।

নিগমানন্দ ঘুম থেকে উঠে বসলেন। অপরিচিত জায়গা। এখন তিনি কি করবেন, কোথায় যাবেন!

এমন সময় সারদাপ্রসাদ মজুমদার নামে এক বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ তাঁর সামনে এসে হাত জোড় করে দাঁড়ালেন।

নিগমানন্দ তাঁর দিকে চাইতেই তিনি বললেন: কাল রাত্রে স্বপ্নে এক জটাজুটধারী সন্ন্যাসী আমাকে বলেছেন যে, তোর মন্দিরের বারান্দায় এক সাধু রাত কাটাচ্ছেন। যোগসাধনার জন্যই তিনি এসেছেন। তুই তাকে সাহায্য কর। তোর তো কল্যাণ হবেই, সারা গ্রামেরই কল্যাণ হবে। আপনি কি সেই সাধু?

নিগমানন্দ বুঝলেন এ সব সুমেরদাসজীর কাণ্ড। এ অলৌকিক ঘটনা তাঁর পক্ষেই ঘটানো সম্ভব। তিনি গুরুদেবের উদ্দেশ্যে প্রণাম জানিয়ে বললেন: তা হবে।

সারদাবাবু তাঁকে বললেন: ইস, কত কষ্টই না আপনার হয়েছে। আমি আগে জানতে পারলে এমন হতো না। আপনি আমায় ক্ষমা করুন।

নিগমানন্দ একটু হেসে বললেন: ভক্তকে পরীক্ষার জন্য ভগবান অনেক সময় তার ওপর অত্যাচার অবিচার করে থাকেন। এর ভিতর দিয়েই তো ভক্তের পরীক্ষা। পাণ্ডবদের কথা নিশ্চয়ই জানো। কুন্তী কি বলেছিল জানো তো! বলেছিল, কৃষ্ণ, তুমি আমাকে আরও দুঃখ দাও, যাতে তোমাকে না ভুলি। দুঃখ-কষ্ট বিপদ-আপদ যার যত আসবে ভগবানের কাছে সে তত পৌছাবে। সুখে থেকে, ভোগে থেকে, ঐশ্বর্যের ভিতর ডুবে কোন মানুষ ভগবানকে ডাকে? দুঃখ-কষ্টের জগদ্দল পাথর ভগবান চাপিয়ে দেন তারই ওপর যে তাঁকে অবিরাম স্মরণ করছে। প্রকৃত ভক্ত কখনও দুঃখ পেয়ে হা-হুতাশ করে না।

একটু থেমে পরে বললেন : না বাবা, আমার এতটুকু কষ্ট হয় নি বরং আমি সারারাত তাঁকে বলেছি, আমাকে আরও ব্যথা দাও। বাবা, আমি সাধনার জন্য জায়গা খুঁজছি। কত জায়গা দেখলাম, কিন্তু মনের মত একটা জায়গাও মিললো না। যদি সেইরকম একটা জায়গার সন্ধান দাও তাহলে তোমার সঙ্গে যেতে পারি।

সারদাবাবু তেমনি ভাবেই হাত জোড় করে বললেন : আমার বাড়ির পেছনে একটা বাগান আছে, সেটাই আপনার সাধনার যোগ্য স্থান হবে, এই আমার বিশ্বাস।

নিগমানন্দ উঠে দাঁড়িয়ে বললেন : আর একটা কথা, আমি যতদিন তোমার এখানে থাকবো কাউকে কিছু বলতে পারবে না।

: বেশ, তাই-ই হবে। আপনি যে ভাবে বলবেন সেই ভাবেই ব্যবস্থা করবো। একটা ঘর আমি আজই তৈরি করিয়ে দেবো। আপনি কৃপা করে আমার সঙ্গে চলুন।

নিগমানন্দ তার পিছন পিছন চলতে লাগলেন।

বৃদ্ধ সারদাবাবু বড় কৃতার্থ হয়ে গেলেন তাঁকে পেয়ে। মনে হলো এবার ভগবান বুঝি তাঁকে পারের কড়ি মিলিয়ে দিয়েছেন। এমন ভাবে এই শেষ বয়সে এই রকম মহাসাধকের সংস্পর্শে আসবেন, এ তাঁর কল্পনাতীত।

তিনি ব্যস্ত ভাবে হাঁটতে লাগলেন। মনে হলো যেন এক পরম লগ্ন তাঁর সামনে এসেছে। দেরি হলে এ লগ্ন বুঝি বিফল হয়ে যাবে।

নিগমানন্দ বাগান দেখে পরম সন্তোষ লাভ করলেন। সারদাবাবুও অকাতরে অর্থব্যয় করে তাঁর সমস্ত কিছুর সুবিধা করে দিলেন। ধীরে ধীরে জায়গাটা তপোবনের মত হয়ে উঠলো।

নিগমানন্দ বেশ মনের আনন্দেই সাধন ভজন করেন। সারদাবাবু এই রকম একজন সাধুর সঙ্গ পেয়ে ধন্য হয়ে যান।

কিন্তু বনে ফুল ফুটলে তার গন্ধ অনেক দূর যায়। হরিপুর বা তার আশপাশের সাত-আটটা গ্রামের মানুষের জানতে বাকী রইলো না যে এক যোগসিদ্ধ মহাপুরুষ এসে সারদাবাবুর বাড়িতে সাধন ভজন করছেন।

প্রতিদিন সকাল বিকাল তপোবন মানুষের ভিড়ে ভরে যায়। সারদাবাবুর মনে আশঙ্কা হয় যে সাধু বোধ হয় বিরক্ত হচ্ছেন। এই ভেবে তিনি সবাইকে

বিকেলে আসতে অনুরোধ জানান। নিগমানন্দ সবাইকেই দর্শন দেন ঘরের বারান্দার ওপর বসে। সামনের উঠান ভরে যায় মানুষের ভিড়ে।

কেউ এসে বলেন: ঈশ্বরপ্রাপ্তির পথ কি? কেউ বলেন: সংসারের জ্বালা থেকে কি করে মুক্তি পাবো? কেউ বা এসে তাঁকে অবতার বলেই ধরে নেন।

সবাইকে আলাদা ভাবে জবাব তিনি দিতে পারেন না—নিগমানন্দ বলেন: আমি অবতার-টবতার কিছু নই। আমি তোমাদেরই মত একজন। আমি শুধু বলতে চাই যে তোমরা সেই পরম করুণাময় ঈশ্বরের শরণাপন্ন হও। তিনিই একমাত্র সকল রোগের মহৌষধ। ঈশ্বর কখনও ব্যক্তিগত সুখ দুঃখে সাড়া দেন না। জগৎসংসারে যারা নিজের নিজের ব্যথার বোঝা ঘাড়ে করে বেড়ায় তারা ঈশ্বরের কাছ থেকে কোন সাহায্য পায় না। ভগবান যত বড়, আমরা তত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্রাপি ক্ষুদ্র। সুতরাং কুম্ভকারের ঘূর্ণীয়মান চক্রে শত সহস্র মৃৎপাত্র তৈরি হচ্ছে। এর ভিতর কোন্‌টা ভেঙে যাচ্ছে, আবার কোন্‌টা বা গড়ে উঠছে। কুম্ভকার তাতে ভ্রূক্ষেপ করে না। গড়া ঠিক ঠিক হয়ে যাচ্ছে। সুতরাং ব্যক্তিগত ভাবে ঈশ্বরের সাথে আমাদের নিরপেক্ষ সম্বন্ধ। আমাদের পক্ষে তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ করা বা প্রত্যক্ষ উপলব্ধি করা সম্পূর্ণ অসম্ভব। ঈশ্বর আছেন কি নেই এ স্বীকার করা যাক আর না যাক তাতে কোন ক্ষতি নেই। কিন্তু সৎ হতে আমাদের দোষ কি! সজ্জন হতে আমাদের বাধা কোথায়? প্রেমিক হতে আমরা পারি না কেন? কিন্তু 'আমি' তো আছি। সেই 'আমি' কেন ভালো হতে পারবো না। এখন প্রশ্ন হচ্ছে, সৎ হবো কি করে? সৎবৃত্তি যার আছে সেই সৎ। সৎসঙ্গ যে করে সেই সৎ, সৎপথে যারা যায় আসে তারাই সৎ। বাসনা কামনা যারা দু'পায়ে দলে চলে, তারাই সৎ। আর এই সৎ হওয়া মানেই ঈশ্বরের কৃপা লাভ। সকলকে ভালোবাসবো, সকলের সুখে হাসবো, সকলের দুঃখে কাঁদবো, এই তো মানুষের সাধনা। এই সাধনায় সিদ্ধিলাভ হলেই তো ঈশ্বর লাভ। কাম ক্রোধ লোভ, মোহ মদ ও মাৎসর্য এই ছয়টি মায়ার লীলাক্ষেত্র। মায়ার এই লীলা-ক্ষেত্রগুলিতে না ঘুরে কেবলমাত্র ব্রহ্মজ্ঞ গুরুতে প্রেমভক্তিমার্গে যারা আত্মসমর্পণ করবে বা জ্ঞানমার্গে ঈশ্বরের স্বরূপ উপলব্ধি করবে, তাদের পথ সোজা হয়ে যাবে। যে সব বিবেক-সম্পন্ন ব্যক্তি ইহলোকে বা পরলোকে অনিত্য সুখ-ভোগের আশা পরিত্যাগ করে শ্রদ্ধার সঙ্গে ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষের উপাসনা করেন

তাঁরা শুদ্ধচিত্তে আত্মজ্ঞান লাভ করেন এবং জন্মমৃত্যু অতিক্রম করে পরম শান্তি লাভ করেন।

নিগমানন্দ একটু চুপ করে থেকে কিছু পরে চারদিক চেয়ে বললেন: আমাকে তোমরা কেউ ভালোবাসো না, ভালোবাসো আমার ঐশ্বর্যকে। এই যে তোমরা সব এসেছো, আমার সামনে বসেছো, তাও ঐ ঐশ্বর্যের দ্বারা আকৃষ্ট হয়েছ। তোমরা এখন আমার সম্মুখে আছ—তোমাদের কথা মনে হচ্ছে। আবার এখান থেকে যখন অন্যত্র চলে যাবো, তখন সেখানেও এমনি চাঁদের হাট। কত লোক কত টাকা-পয়সা দিচ্ছে, কত রকম খাওয়াচ্ছে; আমার কিন্তু কোনদিকে লক্ষ্য নেই। কেউ আমাকে কিছুই দেয় না। আমার ভিতরে যিনি বসে আছেন, তাঁকেই সব অর্পণ করছে। সবাই ভালোবাসে আমার ভিতরের মানুষটাকে।

তোমরা হাসো, অপরকে হাসাও। ঈশ্বরও হাসবেন। তখন আর তোমাকে কাঁদতে হবে না 'আমার' 'আমার' বলে। ঈশ্বর আছেন, তিনি থাকবেনও, তুমি আমি শুধু থাকবো না।

সারদাবাবু নিগমানন্দের একপাশে হাত জোড় করে বসে আছেন। তাঁর চোখ দিয়ে জলের ধারা বয়ে চলেছে।

"অন্তে যেন পাই আমি শ্রীহরিচরণ
পার্থিব পদার্থে মোর নাহি প্রয়োজন।
খ্যাতি প্রতিপত্তি আশা,
প্রীতি, প্রেম, ভালোবাসা।
মায়া, মোহ, দয়া, ধর্ম, দিছি বিসর্জন—
হৃদয় শ্মশান সম ভীতির কারণ।"

পৃথিবীতে আজ সজ্জন মানুষের বড় অভাব। মানুষের মনুষ্যত্ব আজ কোথায় তা খুঁজে পাওয়া যায় না। মনুষ্য জনম শ্রেষ্ঠ জনম, কিন্তু মানুষ সেই জনম লাভ করে পাপের পঙ্কিলাবর্তে অবিরাম ডুব দিচ্ছে। দেব দ্বিজে ভক্তি, তাই বা কোথায়? এদের কি গতি হবে?

"নাহি এ ধরায় এক বিন্দু অশ্রুজল
খল পিশাচেতে পরিপূর্ণ ভূমণ্ডল।
কেহ যাক অধঃপাতে
কারো ক্ষতি নাই তাতে

হিংস্থক পাষণ্ড যত পরশ্রীকাতর—
পাপে পরিপূর্ণ সব বাহির অন্তর।”

অহংকার মানুষের ভগবৎ লাভের প্রধান অন্তরায়। কেন, তোমার কিসের অহংকার? তোমার বড় বাড়ি আছে। কিন্তু জান কি, তোমার ঐ অহংকারের সৌধ এক নিমিষে ধূলিসাৎ হতে পারে। তোমাকে তখন দুগ্ধফেননিভ শয্যা ছেড়ে পথে আশ্রয় নিতে হতে পারে। সুন্দরী স্ত্রীর গর্ব করছো আজ, কাল সেই স্ত্রী তোমাকে ছেড়ে আর একজনের অঙ্কশায়িনী হতে পারে। যে পুত্রের জন্য তুমি অকাতরে স্নেহ ঢালছো, কাল সেই সন্তানকে বুকে করে তোমাকে শ্মশানে যেতে হতে পারে।

তবে তোমার কি আছে এ দুনিয়ায়! একা এসেছো, একা চলে যেতে হবে; তার জন্য এত ভাবনা কেন? তোমার একমাত্র মেয়ের আজকের ফুলশয্যা আগামীকাল যে মৃত্যুশয্যা হবে না, তাই বা কে জানে?

প্রকৃত সুখ আছে ভগবদচিন্তায়, ধর্মাচরণে, সৎসঙ্গ লাভে। এক একটা দিন যাচ্ছে আর আয়ুর ফুল একটা করে ঝরে যাচ্ছে। এখনও সময় আছে—ভগবানের সঙ্গে মিলবার লগ্ন এখনও বয়ে যায় নি। পুত্র, কন্যা আত্মীয় পরিজন নিয়ে পালা গাওয়া তো অনেক হলো, এবার মহাযাত্রার অধিকারীর একবার খোঁজ করলে দোষ কি? সংসার কার? তোমার? কে বললে? যখন পৃথিবীতে এসেছিলে তখন কাকে সাথে করে এনেছিলে? একমাত্র ভগবানই সব, তাঁর মত আর কে আছে? শুধু তাঁরই কোন স্বার্থ নেই। এ অশান্তির হাত থেকে মুক্ত হও। শাস্ত্রে বলছে—

“পিতা কস্য মাতা কস্য কস্য ভ্রাতা সহোদরাঃ?
কায়াপ্রাণে ন সম্বন্ধঃ কা কস্য, পরিবেদনা।”

অনেকেই বলেন আমার কি হবে! আমি তো পাকা ফলের মত ঝুলছি, একদিন টুপ করে ঝরে যাবো, আমাকে একটু কৃপা করুন। দিনরাত সংসারে যে যন্ত্রণা ভোগ করছি এ তো মৃত্যুযন্ত্রণার সামিল। আমার সবই আছে অথচ কিছুই নেই।

উত্তরও মেলে—নেই শুধু একটা জিনিস, ভগবদচিন্তা, ভগবদমনন, ভগবদস্মরণ। মৃত্যুর জন্য এত চিন্তা কিসের? জন্ম যখন হয়েছে তখন মৃত্যু তো হবেই, তবে তার জন্য এত অধীর কেন।

শ্রীমদ্‌ভাগবতে আছে :

"মৃত্যুর্জন্মাবতাং বীর দেহেন সহ জায়তে।
অদ্য বাব্দশতান্তে বা মৃত্যুর্বৈ প্রাণিনাং ধ্রুবঃ ॥"

গীতায় শ্রীভগবান বলেছেন :

"জাতস্য হি ধ্রুবো মৃত্যুর্ধ্রুবং জন্মমৃতস্য চ।
তস্মাদ পরিহার্য্যোঽর্থে ন ত্বং শোচিতুমর্হসি ॥"

মৃত্যুকে জয় করার সাধনাই ভারতের আধ্যাত্মিক সাধনা। যে ভাবে যে কেহ সাধনা করুক তাতে কিছু যায় আসে না। মৃত্যুভয়কে তুচ্ছ করে মৃত্যুঞ্জয় হতে হবে। ভারত সাধকরা চিরকাল এই সাধনা করে গেছেন—তাঁদের ঈশ্বর দর্শন হয়েছে। সকলে তোমরা তাঁদেরই উত্তর সাধক হও—ধন, ঐশ্বর্য, স্ত্রী, পুত্র পেতে দেরি হতে পারে, কিন্তু ভগবানের কৃপা লাভ এক নিমিষেই হতে পারে, যদি তাতে মন প্রাণ সমর্পণ করতে পারো।

॥ ১৭ ॥

যতই দিন যেতে থাকে ততই মানুষের ভিড়ে তপোবন ভরে ওঠে। এই কোলাহলে তাঁর সাধনার বড়ই ব্যাঘাত সৃষ্টি হতে লাগলো।

তিনি এই স্থান ত্যাগ করবার মনস্থ করলেন।

সারদাবাবু তাঁকে অশেষ যত্ন করেছেন। তাঁর যাতে কোন অসুবিধা না হয়, সে দিকে লক্ষ্য রেখেছেন। তাঁকে বলে যাওয়া উচিত কি অনুচিত হবে, এ চিন্তা তিনি মনে মনে করতে লাগলেন।

না বলে যদি এ স্থান তিনি ত্যাগ করেন তাহলে হয়তো তিনি ব্যথা পাবেন। তিনি সোজা তপোবন থেকে বেরিয়ে সারদাবাবুর ঘরে গিয়ে উঠলেন।

সারদাবাবুর ঘরে কোনদিন যিনি আসেন নি, তাঁকে হঠাৎ আসতে দেখে তিনি অত্যন্ত সন্তোষ বোধ করলেন ও পরম সমাদরে বসালেন। ঘরখানা দেব-দেবতার ছবিতে সুসজ্জিত। কৃষ্ণ-রাধিকা, নিমাই, কালী, সকলেই যেন বাঁধা পড়েছেন সারদাবাবুর ঘরে।

নিগমানন্দ দেখলেন চারদিক চোখ মেলে।

সারদাবাবু হাত জোড় করে আছেন।

নিগমানন্দ একটু হেসে বললেন: তোমার অভাব কি! দুঃখই বা কি! সবাইকে তো ধরে রেখেছো। একজনের কৃপা না হলে আর একজনের কৃপা হবেই। যার ভাব আছে তার অভাব নেই। ভাব যাতে বেশী আসে, সেই চেষ্টা করো, তাহলে ঐ ছবি সব জীবন্ত হয়ে উঠবে।

সারদাবাবু বলেন: আপনি আমায় আশীর্বাদ করুন।

নিগমানন্দের শ্রীকৃষ্ণের ছবির দিকে চেয়ে কেমন যেন একটু ভাবান্তর হলো। চোখ বুজে খানিকক্ষণ থেকে পরে বললেন: কৃষ্ণকে কেউ বলে একজন, কেউ বলে চারজন। বেদান্তের চোখে দেখলে দেখা যায় যে, জীব চৈতন্য, কুটস্থ চৈতন্য, ঈশ্বর চৈতন্য ও কৃষ্ণ চৈতন্য। বৈষ্ণবের তুরীয় কৃষ্ণই পরম কৃষ্ণ, বেদান্তের ব্রহ্মচৈতন্য, শ্রীকৃষ্ণ তত্ত্বটি বড়ই জটিল। এর রহস্য ভেদ করতে বহু অনুশীলনের প্রয়োজন। শ্রীকৃষ্ণের নরলীলা পূর্ণ নরলীলা। একটা মানুষ চারটি

অবস্থার ভিতর দিয়ে গেলেই পূর্ণত্ব প্রাপ্তি হয়। যেমন বাল্য, যৌবন, প্রৌঢ় ও বার্ধক্য। শ্রীকৃষ্ণের ভিতর সব সময় অতিমানব বিদ্যমান। বাল্যে অসুর নিধন, কালীয় দমন, যৌবনে বিয়ে করলেন ষোল হাজার রমণী। শ্রীকৃষ্ণ এতজনের কি করে মনোরঞ্জন করতে পারেন! নারদ একদিন তা দেখতে গেলেন। দেখলেন তিনি কারও সঙ্গে তত্ত্ব কথা বলছেন, কারও সঙ্গে পাশা খেলছেন। কারও সঙ্গে মন্ত্রণা করছেন রাজ্য সম্বন্ধে, কারও ঘরে তিনি আহার করছেন। কারও ঘরে গিয়ে মানভঞ্জন করছেন। কারও সঙ্গে ঝগড়া করছেন। প্রত্যেক ঘরেই তিনি প্রত্যেকের হৃদবৃত্তি অনুসারে চলেছেন।

প্রৌঢ়ে তিনি কখনও যুদ্ধ-বিগ্রহের আয়োজন করছেন, কখনও বিদুরের গৃহে খুদ খাচ্ছেন, কখনও বিশ্বরূপ ধারণ করছেন। বার্ধক্যে যদুবংশ তিনি নিজেই উচ্ছেদ করে যোগবলে দেহত্যাগ করলেন। সব অবস্থাতেই একই কৃষ্ণ। কৃষ্ণ এক। একই কৃষ্ণ। তাঁর মত প্রেমিক, তাঁর মত ভোগী, তাঁর মত যোগী, তাঁর মত স্বামী, তাঁর মত যোদ্ধা, তাঁর মত জ্ঞানী গুরু আর কি কথাও আছে? তারপরই আসে রাধিকা।

বৈষ্ণবতত্ত্ব ও শক্তিতত্ত্ব-এর ভিতর ছোট বড় কিছুই নেই—ঈশ্বর লাভের এ একটা স্তর মাত্র। সাধকের প্রথম স্তরে শক্তিভাব, চরম স্তরে বৈষ্ণব। যিনি মা তিনিই রাধা। বহিরঙ্গাশক্তি মা। অন্তরঙ্গা শক্তি তিন প্রকার। সৎ, চিৎ, আনন্দ। এই আনন্দময়ী শক্তিই রাধা। সাধনার বস্তু এটা নয়। এ ভাব যে কার কখন হয় তা কেউ বলতে পারে না। এটা স্বভাবের অভিব্যক্তি, "নিত্য সিদ্ধ কৃষ্ণ প্রেম সাধ্য কভু নয়"। কৃষ্ণ হলেন প্রেমের সাধক; তাঁর গুরু হলেন রাধা। নিত্যধামে কিন্তু এর উলটো। সেখানে পরমপুরুষই প্রেমে একমাত্র সিদ্ধ। কামজয়ী না হলে প্রেমের লীলা হবে না।

শ্রীশ্রীঠাকুর নিগমানন্দের শ্রীমুখের বাণী শুনে সারদাবাবু কাঁদছেন। চোখের জলে তাঁর বুক ভাসছে।

তারপর একদিন সারদাবাবুকে না জানিয়ে তিনি স্থান ত্যাগ করলেন। তবে যাবার সময় একটুকরো কাগজে লিখে রেখে এসেছিলেন: সাধন কার্যে নানারূপ অসুবিধা আর কোন গুরুতর কারণে এ স্থান ছেড়ে গুরুর আদেশে অন্যত্র চললাম।

স্বামী নিগমানন্দ গৌহাটীর পথে রওনা হলেন হরিপুর ছেড়ে। কার কাছে

তিনি যাবেন, কোথায় তিনি থাকবেন এ সব চিন্তা না করে কামাখ্যায় যাবার উদ্যোগী হলেন।

পথ দিয়ে চলতে চলতে কে একজন তাঁকে ডাক দিলেন।

স্বামী নিগমানন্দ থামলেন।

: কামাখ্যায় না হয় দু'দিন পরেই যেও। এ দু'দিন আমার এখানে থেকেই যাও।

ভদ্রলোকের নাম যজ্ঞেশ্বর বিশ্বাস। গৌহাটীর কমিশনার। একে নিগমানন্দ বয়সে নবীন তার ওপর সুপুরুষ চেহারা; হয়তো তিনি একটু বাজিয়ে দেখবেন এই সাধুকে।

নিগমানন্দ বললেন: আমি যে কামাখ্যা যাবো, কি করে জানলেন।

: এত দূর এসেছো, আর কামাখ্যায় যাবে না, এ কখনও হতে পারে?

নিগমানন্দ মনে মনে একটু হাসলেন।

যজ্ঞেশ্বরবাবু বললেন: গীতা পড়েছো?

: পড়েছি, তবে তা গুরুর কাছে।

: আচ্ছা, গীতায় সেই শ্লোকটা—ঐ যে "জাতস্য হি ধ্রুব মৃত্যু, ধ্রুবম্ জন্ম মৃতস্য চ" এ কথার তাৎপর্য কি? জন্মালেই যদি মরতে হয় আর মরলেই যদি জন্মাতে হয়, তাহলে সংসার-ধর্ম সাধন ভজন করে কি লাভ?

নিগমানন্দ তাঁর মুখের দিকে চেয়ে বললেন: জন্মে যদি সদগুরু লাভ হয়, যদি আত্মসাক্ষাৎকার হয়, তাহলে জ্ঞান হয় যে, প্রকৃত জন্মই আমার হয় নি। যার জন্ম হয় নি তার মরণ হবে কি করে? এটা তখনই উপলব্ধি করা যায়। আসা যাওয়া শুধু জড়ের এবং সেই জড়ের যখন আমিত্ববোধ নষ্ট হয়, তখন আর তার আগমন হয় না।

যজ্ঞেশ্বরবাবু আর কিছু না বলে অন্যত্র চলে গেলেন। নিগমানন্দ তাঁর এই ব্যবহারে অসন্তুষ্ট তো হলেনই না, বরং সন্তুষ্টই হলেন। সাধুকে বাজিয়ে যারা নিতে জানে তারাই প্রকৃত বাজনদার।

যজ্ঞেশ্বরবাবু তাঁর সঙ্গে অনেক রকম আলোচনা করলেন। তিনি তাঁকে অনুরোধ জানালেন এখানেই থেকে যেতে এবং তিনি তাঁর সাধন ভজনের সমস্ত রকম সুবিধা করে দেবেন বলে প্রতিজ্ঞা করলেন।

॥ ১৮ ॥

১৩১২ সালে উজ্জয়িনীতে কুম্ভমেলা অনুষ্ঠিত হয়। স্বামী নিগমানন্দ জানতে পারলেন যে, তাঁর গুরু স্বামী সচ্চিদানন্দ শৃঙ্গেরী মঠের জগদগুরু শংকরাচার্যের সঙ্গে এলাহাবাদে আছেন।

মেলায় যোগদান করে দেখেন বৈদান্তিক সাধুরা সব জমা হয়েছেন। শংকরাচার্য মাঝখানে বসে আছেন আর তাঁর পাশে স্বামী সচ্চিদানন্দও বসে অন্যান্য সাধুদের সঙ্গে আলাপ আলোচনা করছেন।

নিগমানন্দ সোজা গিয়ে সচ্চিদানন্দকে প্রণাম করলেন।

সঙ্গে সঙ্গে উপস্থিত সন্ন্যাসীরা বলে উঠলেন: নবীন সন্ন্যাসীর এ কি ব্যবহার! জগদগুরু শংকরাচার্যকে আগে প্রণাম না করে আগেই সচ্চিদানন্দকে প্রণাম করলেন! এতে আমরা সন্তুষ্ট হতে পারলাম না।

স্বামী নিগমানন্দ বললেন: মদগুরু জগৎগুরু।

"মন্নাথঃ শ্রীজগন্নাথো মদগুরু শ্রীজগৎগুরু।
মদাত্মা সর্বভূতাত্মা তটাম শ্রীগুরুবে নমঃ॥"

শংকরাচার্য বললেন: বাচ্চার কথাই ঠিক! ওর কথা উড়িয়ে দেওয়া যায় না। অদ্বৈতবাদ সম্বন্ধে সম্পূর্ণ জ্ঞানলাভ ওর হয়েছে, তাই তার গুরুতে ও আমাতে অভেদ জ্ঞান করেছে।

পরে জেনে তিনি আরও সন্তুষ্ট হলেন যে নিগমানন্দ সচ্চিদানন্দর শিষ্য।

শংকরাচার্য বললেন: তুমি পাহাড় পর্বত সাগর সব দেখেছো?

: হ্যাঁ, সব দেখেছি।

: আর কি দেখেছো?

: "ত্রৈলোক্যং যানি ভূতানি।
তানি সর্বানি দেহতঃ॥"

শংকরাচার্য হেসে সচ্চিদানন্দকে বললেন: তুমি একে এখনও দণ্ডী বহাচ্ছ কেন? এ তো পরমহংস হয়ে গেছে।

স্বামী নিগমানন্দ পরমহংস হলেন।

এলাহাবাদ থেকে তিনি কাশীতে আসেন। সম্পূর্ণ অপরিচিত জায়গা।

তাঁর কাছে অর্থাদিও নেই। ক্ষুধার আহার কি ভাবে যোগাড় হবে এই সব ভাবতে ভাবতে তিনি দশাশ্বমেধ ঘাটে এসে বসলেন।

সমস্ত শরীর তাঁর ক্লান্তিতে ভরা। ক্ষুধাতে তাঁর শরীর অবসন্ন হয়ে পড়েছে।

কিন্তু কাশী তো অন্নপূর্ণাক্ষেত্র, এখানে তো কেউ না খেয়ে থাকে না। তবে তার ভাগ্যে কি খাওয়া জুটবে না!

তিনি ধ্যানে বসলেন—কাশী কেমন অন্নপূর্ণাক্ষেত্র আজ তিনি তা পরীক্ষা করে দেখবেন। দেখা যাক অন্নপূর্ণার কি মহিমা।

ভক্ত আর ভগবানে পরীক্ষা।

নিগমানন্দ ধ্যানস্থ হলেন।

তিনি দশাশ্বমেধ ঘাটের সিঁড়ির ওপর ঐ ভাবে বসে আছেন ধ্যানস্থ হয়ে। মানুষের ভিড়ে ঘাট যেন কোলাহলমুখর। কত রকম লোকের যাতায়াত। কেউ এসেছে স্নান করতে। কেউ এসেছে সাধু সন্দর্শনে। কেউ কেউ একবার নিগমানন্দের দিকে তাকাচ্ছে আবার কি ভেবে আনমনে চলে যাচ্ছে; কেউ বা এসে নিগমানন্দের অজান্তে প্রণাম করে বিদায় নিচ্ছে।

রোদ্দুরের তেজ ক্রমশঃ বাড়ছে।

নিগমানন্দ নির্বিকার। রোদ্দুরের তেজে তাঁর সারা অঙ্গে যেন আগুনের তাপ লাগছে; তবুও তাঁর কোন ভ্রূক্ষেপ নেই।

হঠাৎ এক বৃদ্ধা এসে তাঁর সামনে দাঁড়ালেন।

বৃদ্ধার পরনে জীর্ণশীর্ণ বস্ত্র। মাথার চুলে যেন পাখির বাসা; দেখতেও তেমনি কদাকার। হাতে তার একটা শালপাতার ঠোঙা। বৃদ্ধা নিগমানন্দের সামনে এসে বললেন: বাবা, এই ঠোঙাটা রইলো, আমি একটা ডুব দিয়ে এসে আবার ঠোঙাটা নিয়ে যাবো। বৃদ্ধা সিঁড়ি বেয়ে নীচে নেমে গেলেন।

নিগমানন্দ এমনি গভীর ভাবে ধ্যানস্থ হয়ে গেছেন যে কখন বেলা গড়িয়ে সন্ধ্যে হয়েছে তাও তাঁর খেয়াল নেই। দেখতে দেখতে রাত্রির অন্ধকার ছেয়ে গেলো চারপাশ।

রাত কত কে জানে। ক্ষুধা-তৃষ্ণায় সমস্ত শরীর এত কাতর হয়েছে যে তাঁর যেন আর নড়বার ক্ষমতা নেই।

বড় দুঃখ হলো এই ভেবে যে অন্নপূর্ণার দ্বারে এসে তাঁকে শেষে অভুক্ত থাকতে হবে?

হঠাৎ ঈষৎ আলোর ঝলকে দেখলেন তাঁর একপাশে একটা শালপাতার ঠোঙা পড়ে আছে। সেই দুপুর থেকেই তো এ ঠোঙাটা এখানেই পড়ে আছে।

এক বৃদ্ধা যে রেখে গেলো কিন্তু সে তো আর ফিরে এলো না। তাহলে নিশ্চয়ই তার ভুল হয়ে গেছে। স্নান পর্ব শেষ করে তার ঘরে ফিরে গেছে।

নিগমানন্দ ঠোঙাটা খুলে দেখলেন ঠোঙা ভর্তি খাবার। তিনি আর কোন কিছু না ভেবে সব খাবারটাই খেয়ে নিলেন। পরে তিনি গঙ্গায় নেমে জল খেলেন প্রাণ ভরে। মনে হলো, যেন তাঁর দেহের ক্লান্তি এক নিমিষেই দূর হয়ে গেলো।

ভাবলেন, একেই বলে ভাগ্য! কার খাবার কে খায়!

তিনি ধীরে ধীরে উঠে এসে একটা বাড়ির বারান্দায় এসে শুয়ে পড়লেন। দুই চোখে তাঁর হাজারো ঘুমের আবেশ। তিনি ঘুমিয়ে পড়লেন।

গভীর নিদ্রায় মগ্ন আছেন স্বামী নিগমানন্দ।

আর কোন কোলাহল নেই। চারদিক নীরব নিথর। মানুষের চলাফেরাও বন্ধ হয়ে যায়। শুধু মাঝে মাঝে দু-একটা রাতচরা গরুকে চরতে দেখা যায়।

রাত তখন গভীর। নিগমানন্দ দেখলেন, চারদিক আলোয় আলোময় হয়ে গেছে। এত রাতে এ আলোর রোশনাই কোথা থেকে এলো? নিগমানন্দ দেখলেন, চারদিক আলো করে স্বয়ং মা অন্নপূর্ণা তাঁর সামনে।

হাসিভরা মুখে অন্নপূর্ণা বললেন: এবার তো বিশ্বাস হলো যে, কাশীতে কেউ অভুক্ত থাকে না। ঐ খাবারগুলো তো আমিই তোমাকে দিয়ে এসেছিলাম।

নিগমানন্দ বললেন: সেকি মা! তুমি কখন এলে? এক জীর্ণশীর্ণ বৃদ্ধা ওগুলো রেখে দিয়ে সেই যে গেলো আর ফিরলো না।

: কেন বাবা, নির্গুণ কি সগুণ রূপ ধরতে পারে না? আমি যে সব রকম বেশ ধরতে পারি, আমার বেশ বদলাতে তো বেশী সময় লাগে না। আমি যে ঐ বেশেই তোমার কাছে গিয়েছিলাম। বিশ্বরূপ যিনি ধরেছেন তিনি একটা বৃদ্ধার রূপ ধরতেও পারেন। তোমার সাধনা এখনও সম্পূর্ণ হয় নি। ভগবদতত্ত্ব সম্বন্ধে জানতে হলে এখনও তোমাকে ভাবের সাধনা, প্রেমের সাধনা করতে হবে। তোমার পরব্রহ্মজ্ঞান লাভ হয়েছে, কিন্তু অপর ব্রহ্মের জ্ঞান তুমি এখনও লাভ করতে পারো নি। ভাবের সাধনায় এগোতে পারলে সব খুলে যাবে।

নিগমানন্দের স্বপ্ন ভেঙে গেলো।

তিনি উঠে বসলেন, সারা দেহ-মন এক অজানা ব্যথায় জর্জরিত হয়ে গেলো। সাধন-পথে এতদূর এসেও এখনও তাঁর পূর্ণতা আসে নি। কোথায় গেলে, কার কাছে গেলে তাঁর সাধক জীবনে পূর্ণতা আসবে। হঠাৎ তাঁর মনে পড়ে গেলো গৌরী মা'র কথা। তিনি তাঁকে দেখা করতে বলেছিলেন। দু'বছর আগের কথা, এখন গেলে কি তিনি তাঁকে চিনতে পারবেন ?

তিনি পায়ে হেঁটেই গৌরী মা'র আশ্রমের উদ্দেশ্যে রওনা হলেন। অবশেষে একদিন হাঁটতে হাঁটতে গৌরী মা'র আশ্রমে পৌঁছালেন। দু'বছর আগে যা দেখেছিলেন এখন আর সে সব নেই। এখন সে জায়গা নবীন রূপ ধারণ করেছে। সুন্দর সুসজ্জিত ঘর, ফুলের বাগান।

গৌরী মা যেন তাঁরই প্রতীক্ষায় ছিলেন।

স্বামী নিগমানন্দ তাঁর সামনে গিয়ে বললেন : দু'বছর আগে স্বামী সচ্চিদানন্দের সঙ্গে আমি আপনার কাছে এসেছিলাম, তখন আপনি বলেছিলেন যে, যদি কোনদিন আমি নির্বিকল্প সমাধি লাভ করতে পারি, সেদিন যেন আপনার সঙ্গে দেখা করি। তাই আমি এসেছি।

গৌরী মা বললেন : তুমি কিভাবে সাধন ভজন করছো।

নিগমানন্দ জবাব দিলেন : প্রথমে তন্ত্রসাধনায় মহাশক্তির সাক্ষাৎ পাই কিন্তু মনের পূর্ণতা না আশায় পরে জ্ঞানের এবং তৎপরে যোগের সাধনা করতে করতে নির্বিকল্প সমাধি এসে যায়।

: ভুল করছো, বেদান্ত সাধনা, ভাব সাধনা, যোগ সাধনা করে যা জানা যায় সেই তত্ত্ব সম্বন্ধে জানবার জন্য তুমি তাঁর কাছে বর প্রার্থনা করলে না কেন, তাহলে এত ঘুরে ঘুরে বেড়াতে হতো না। মহাশক্তির ভিতরেই তো সব কিছু নিহিত আছে। তাঁকে পেলে অথচ কিছুই নিলে না ! বেদ-বেদান্ত যোগ, জ্ঞান, ভাব সবই তো তিনি। তাঁকে পেয়ে ছেড়ে দিয়ে এখন ঘুরে বেড়াচ্ছ।

একটু থেমে তিনি বললেন : ভগবানকে পেলেই তো সব পাওয়ার শেষ। মানুষের জীবনে এর চেয়ে আর তো বড় পাওয়া কিছু নেই। যিনি স্বয়ং তত্ত্বরূপী, সব তত্ত্বের সন্ধান রাখেন, তাঁকে জানলেই তো সব তত্ত্ব জানা হয়ে গেলো। যিনি যুগে যুগে প্রেমের কাঙাল, তাঁর প্রেমে একবার পড়তে পারলে আর তো কিছুর অভাব থাকে না। প্রকৃত ভালোবাসতে যে জানে সেই জানে তাঁর সন্ধান। এই ভালোবাসাই তো ভগবানের পূর্ণ রূপ।

স্বামী নিগমানন্দ গৌরী মা'র আশ্রম থেকে আবার রওনা হয়ে গৌহাটী এসে যজ্ঞেশ্বরবাবুর বাসায় উঠলেন। যজ্ঞেশ্বরবাবু ও তাঁর স্ত্রী তাঁর কাছে দীক্ষা নিলেন।

যজ্ঞেশ্বরবাবুর বাসায় থাকার সময় প্রায়ই তাঁর ভাবসমাধি হতো। ঐ অবস্থায় তখন তাঁর চেহারা ভিন্নরূপ ধারণ করতো। তাঁর চোখ দিয়ে যেন আগুন বের হতো। কখনও তিনি বালকের মত কাঁদছেন, কখনও থামছেন, কখনও কাউকে জড়িয়ে ধরছেন।

ভাব সমাধি ভঙ্গ হলে নিগমানন্দ ধীরে ধীরে পূর্বাবস্থায় ফিরে আসতেন। যজ্ঞেশ্বরবাবু ও তাঁর স্ত্রী তাঁকে সেবা যত্নে ভরিয়ে রাখলেও ঠাকুর এখানে আর বেশী দিন থাকতে চাইলেন না।

যজ্ঞেশ্বরবাবুর স্ত্রী সরযূ দেবী তাঁকে ছাড়বেন না।

স্বামী নিগমানন্দ আশ্বাস দিয়ে বলতেন: তোমাদের সেবা যত্নে আমি তো কোন্ ছার, স্বয়ং ভগবানও সন্তুষ্ট হবেন। এই সেবা-মন ভগবানে অর্পণ করে চিরসুখী হবে।

সরযূ দেবীর চোখে জল দেখা দেয়। তিনি বলেন: ঠাকুর, আর ক'দিনই বা বাঁচবো, ভেবেছিলাম শেষের ক'টা দিন আপনার সেবা করেই কাটাবো, কিন্তু তা আর ভাগ্যে হলো না। শোকে তাপে শরীর জর্জর হয়ে গেলো। জীবনে সুখ যে কি জিনিস তাও জানলাম না। শেষ সময়ে আপনাকে পেলাম, তাও আবার হারাতে হবে।

স্বামী নিগমানন্দ তাঁকে প্রবোধ বাক্যে বলেন: এ দুনিয়ায় কেউ সুখী নয় জানবে। ভাবছো, যাঁরা সাধন ভজন করেন তাঁদের মত সুখী বুঝি আর কেউ নেই। কিন্তু তাঁদেরও তো সুখ নেই। দুঃখটা কি জানো? ঈশ্বর দর্শন হলো কই। সব দুঃখের সান্ত্বনা আছে মা, কিন্তু এ দুঃখের কোন সান্ত্বনা নেই। শোক তাপের কথা বলছো মা! কার জন্য শোক? যার জন্য শোক করছো সে তো তোমার কেউ নয়! মানুষের এই অবুঝ ভাবের জন্য যত দুঃখ কষ্ট। পুত্রশোক বলো, বিষয় শোক বলো, ঘর বাড়ির জন্য শোক বলো, একটু চিন্তা করে দেখলে আর মনঃকষ্ট হয় না। পুত্র-শোকে অধীর হয়েছো কিন্তু তুমি কি জানো, ঐ পুত্র বেঁচে থাকলে তার অত্যাচার আর দুর্ব্যবহারে তোমার সারাজীবন হয়তো জ্বলে পুড়ে ছাই হয়ে যেতো, ঘর বাড়ি হারিয়ে পথে

দাঁড়িয়েছো, কিন্তু তুমি কি জানতে যে ঐ ঘরে ভীষণ বিষধর সাপের আস্তানা ছিল। ভগবান সব সময় মঙ্গলময় জানবে। কারও জন্য দুঃখ করা উচিত নয়! কার সংসার তুমি করছো? সংসার পাততে না পাততেই তা শেষ হয়ে যেতে পারে। ভগবানের চৌকিদার তোমরা, সব কিছু রক্ষণাবেক্ষণের ভার তিনি তোমাদের ওপর দিয়েছেন। কেড়ে নেওয়া, বেশী দেওয়া সবই তো তাঁর ওপর নির্ভর করে।

একটু থেমে তিনি বলতে শুরু করলেন: বন্ধন শিথিল করো, যত এঁটে বাঁধতে যাবে ততই ফসকে যাবে।

শংকরাচার্য বলছেন:

"বন্দো হি কো? যো বিষয়ানুরাগঃ।
কো বা বিমুক্তি? বিষয়ে বিরক্তি॥

ভোগ বিলাসে যার আসক্তি প্রবল, অনুরাগ বেশী, তার নামই তো বন্ধন। আর মুক্তি বিষয়-বাসনা যার নেই সেই মুক্তপুরুষ। যে যে কাজে লিপ্ত, যে কাজ ভগবানের, ভগবানকে সুখী করাই মানব জীবনের প্রধান লক্ষ্য হওয়া দরকার। ভগবানকে কি ভাবে সুখী করা যায়! সৎভাবে চলে সৎবৃত্তি দিয়ে মনকে গড়া, মানুষের সেবা, সব সময়ে নিজেকে আনন্দে রাখা, এই তো ভগবানকে সুখী করার প্রধান কথা। চাঁদের আলো দেখে যে আনন্দ, সেও ঐ ঈশ্বরানন্দ। আমরা তো চাকর। ঈশ্বর আমাদের প্রভু; যে কাজে প্রভু সন্তুষ্ট হন, তাঁর প্রিয়পাত্র হয়ে চাকরি পাকা করতে পারি, সেই চেষ্টাই আমাদের করা প্রয়োজন। ছেলেমেয়ে স্বামী স্ত্রী, শোক, তাপ, সুখ-দুঃখ, সাধন ভজন, দান ধ্যান এ সব তো তাঁরই, আমার আবার কি আছে? মনিব সংসার পেতেছে, আমরা কাজ করে চলেছি। সংসারকে যারা নিজের বলে মনে করে, পুত্র কন্যা আত্মীয় পরিজনকে যারা নিজের মনে করে তাদের চিন্তাতেই দিন কাটায়, তাদের দুঃখ অনিবার্য। চুরাশি কোটি যোনী পার হয়ে যে মনুষ্য জনম লাভ হয়েছে তা কি শুধু আমার আমার বলেই কেটে যাবে। আর কিছুই কি ভাববে না। শুধু দিনরাত স্ত্রী-পুত্র নিয়ে সুখভোগ করে আমোদ আহ্লাদ করেই কাটাবে। যে আলোর ঝিলমিলিতে বসে স্ত্রীর সঙ্গে প্রেমালাপ করছ, তা যে আলো ফুরিয়ে গেলে অন্ধকারে সমাপ্তি ঘটবে না, কে বলতে পারে। আজ তোমার অনেক অর্থ হয়তো এসেছে। পরম সুখে দিন কাটাচ্ছো; কিন্তু পিছন ফিরে চেয়ে দেখো, মহাকাল সবার অলক্ষ্যে বসে দুঃখের পাঁচালী লিখে চলেছে। মানুষ

হয়ে জন্মে তুমি বিধাতাপুরুষকে চিনলে না। জানবার সময় পেলে না—তারপর তুমি কি করবে! শাস্ত্রে বলেছে:

"যা চিন্তা ভুবে, পুত্র-পৌত্র-ভরণ-ব্যাপারসম্ভাষণে,
যা চিন্তা ধনধান্য ভোগঃ যশদাং লাভে সদা জায়তে।
যা চিন্তা যদি নন্দনন্দন-পদ দ্বন্ধারবিন্দে ক্ষণং।
কা চিন্তা যমরাজ-ভীম-সদন-দ্বার প্রয়াণে প্রভো॥"

পৃথিবীতে এসে স্ত্রী-পুত্র-কন্যাদের যে চিন্তা মানুষ করে, তাদের ভাবনায় মানুষ যে ভাবে অস্থির হয়, তার কিছুটা যদি ভগবানের চরণে অর্পণ করতে, তাহলে যমরাজকেও তুচ্ছ জ্ঞান করতে পারতে। কার জন্য তুমি কাঁদছো? পুত্র, কন্যা, ভ্রাতা—তোমার চোখের জলে বন্যা বয়ে গেলেও তাকে ফেরাতে পারবে না। তোমার অর্থ, তোমার বিষয়, তোমার আত্মীয় বন্ধু-বান্ধবের কি ক্ষমতা আছে? সংসার পেতেছো বলে শুধু সংসারের চিন্তাই করতে হবে? অর্থ আছে বলেই কি, সে অর্থ কি করে দ্বিগুণ করা যায় সেই চিন্তাই করতে হবে? পরমার্থের সন্ধান নিতে দোষ কি! ঘর সাজিয়েও তো মন সাজানো যায়—বিষয়ে মগ্ন থেকেও তো পরম বস্তুর খোঁজ নেওয়া যায়।

মহাসাধক তুলসীদাস বলেছেন:

"তুলসী ঐশা ধেয়ান ধর
জৈসী ব্যান কী গাই।
মুহমে তৃণ চানা টুটে
চেৎ রক্‌খে বছাই॥

বিয়ানো গাই যতই ঘাস খাক, দানা ছোলা খাক কিন্তু তার মন থাকে বাছুরের দিকে।

মানুষের এত মৃত্যুভয় কেন! তুমি কি অমরত্ব লাভ করেছো? জন্মেছো যখন তোমার মরণ সুনিশ্চিত। মৃত্যুর মত সত্য এ পৃথিবীতে আর কিছুই নেই। মৃত্যু আছে বলেই মানুষ আজও বেঁচে আছে। মৃত্যুর কথা মনে হলে মানুষ ক্ষণকালের জন্য স্থিতপ্রাজ্ঞ হয়। মৃত্যু না থাকলে মানুষের পৃথিবী আজ অমানুষে ভরে যেতো! মৃত্যুই সাক্ষাৎ ভগবান, মানুষের যেটুকু সৎকর্ম, ধর্মচর্চা, সবই মৃত্যু আছে বলে। পৃথিবীতে সব কিছুর অনিশ্চয়তা আছে, সংশয় আছে, সন্দেহ আছে, কিন্তু মৃত্যু নিশ্চিত। মৃত্যুর জন্য আমাদের প্রতিনিয়ত তৈরি থাকা দরকার। মৃত্যুর কথা যত মনে পড়বে

মানুষ তত খাঁটি হবে। মৃত্যুর কথা বিস্মরণ হওয়া মানে অপমৃত্যুর হাতে আত্মসমর্পণ করা।

আজ হোক, কাল হোক যখন মরতেই হবে তখন বেঁচে থেকে প্রত্যেকের কিছু সৎকাজ করা উচিত। তুমি রাজা তুমি প্রজা। তুমি প্রবল প্রতাপশালী। তুমি দীন। তোমার অপরিণত বয়স। তাতে কিছুই যায় আসে না। মৃত্যুর কাছে কোন ক্ষমা নেই। তার কাছে আত্মসমর্পণ সবাইকে করতেই হবে।

ঘর সাজিয়েছো কার জন্য ? অর্থই বা জমিয়েছো কার জন্য ? পুত্র-স্নেহে অন্ধ হয়েছো—:সব তো একদিন ফেলে যেতে হবে। আসক্তি আর মায়াই তো মৃত্যুর পরম শত্রু। এই দুটো জিনিসই তো মানুষকে মৃত্যুর কথা ভুলিয়ে রেখেছে। মৃত্যুচিন্তা যার আছে সেই তো সুখী—যদি সে ভাবে সে তো শ্মশানেই বসে আছে, শ্মশানের চিতাই তার সুখ-শয্যা, মৃত্যুর স্নেহময় কোলেই তো সে দিনরাত শুয়ে আছে।

সরযূ দেবীর চোখের জলে বুক ভাসছে। ঠাকুরের দিকে এক দৃষ্টে চেয়ে আছেন আর শুনছেন তাঁর কথা।

নিগমানন্দ উঠে দাঁড়ালেন : মা, দেহ মন যার পরিষ্কার থাকবে, ভগবানকে সে তাড়াতাড়ি কাছে পাবে। তাকে পাওয়ার জন্য ডাকতে হবে না। যাগ-যজ্ঞও করতে হবে না। সৎ কাজ করো, সৎ প্রবৃত্তিতে মনোনিয়োগ করো, তিনি নিজেই আসবেন তোমার কাছে। সৎভাবে যে চলে তার কোনদিন অভাব হবে না—কারণ সে যে তার ভাবেতেই পাগল। অভাব কোন্ পথে তার কাছে আসবে ?

সরযূ দেবী অনেক অনুনয় করলেন, আরও কিছুদিন থেকে যেতে।

কিন্তু ঠাকুর রাজী হলেন না।

যজ্ঞেশ্বরবাবু বললেন : বাবা, এবার কোন্‌দিকে যাবেন ?

ঠাকুর বললেন : কোন্‌দিকে যে যাবো তা বলতে পারি না, তবে ইচ্ছে আছে কামাখ্যা হয়ে কাশী যাবো। সেখান থেকে যাবো দেশে।

সরযূ দেবী বললেন : কোন্ দেশে ?

ঠাকুর নিগমানন্দ বললেন : কেন, আমার নিজের দেশে। সেই নদীয়ার কুতুবপুরে। বারো বছর কেটে গেলে একবার করে যাওয়ার রীতি আছে।

সরযূ দেবী বললেন : আবার কবে এদিকে আসবেন ?

: তা কি বলতে পরি ! এমনও তো হতে পারে যে মহাপথের যাত্রী হয়ে যাবো।

: না বাবা, ও কথা বলবেন না।

তিনি ও যজ্ঞেশ্বরবাবু ঠাকুরকে প্রণাম করে বললেন : আশীর্ব্বাদ করুন, যেন আপনার চরণ ছাড়া না হই।

নিগমানন্দ তাদের হাত ধরে বললেন : মনকে বশে আনো। মনকে জয় করতে পারলে তুমি বিশ্বজয়ী হবে। মহাত্মা কবীর বলেছেন :

"তনথির মনথির বচনথির স্নরত নিরতথির হোয়।
কহে কবীর হসপলক কো কলপ না পাওয়ে কোঈ॥"

মা শেষে একটা কথা বলি, ভগবানের কাছে পৌছানোর বিভিন্ন পথ আছে। যে যে পথে গিয়ে তাড়াতাড়ি পৌছাতে পারে সেই চেষ্টাই করে। সবাই মিশছে একই জায়গায়। দেওয়ালটাকে ভগবান ভেবে যদি একাগ্র মনে আরাধনা করো তবে সেও তোমার ভগবৎ আরাধনাই হবে। একাগ্রতা ও একনিষ্ঠতাই ভগবৎ চরণে পৌছানোর প্রথম দুটো সিঁড়ির ধাপ। এ দুটো পার হতে পারলে আর অসুবিধে নেই। ভগবান নেই যারা বলে তারা ভ্রান্ত। বিজ্ঞান বলো আর ইতিহাস বলো আর যত আবিষ্কার বলো সব ভগবানের শক্তি দিয়েই হচ্ছে। ভগবান ছাড়া এ পৃথিবীতে কিছু নেই, কিছু হতে পারে না। কালীকে ডাকো আর কৃষ্ণকেই ডাকো আর শিবকেই ডাকো, চিত্তকে পরিষ্কার রেখে একমনে ডাকবে।

স্বামী নিগমানন্দ যজ্ঞেশ্বরবাবুর বাসা থেকে বের হয়ে আবার পথে নামলেন।

পথ যাকে হাতছানি দিয়ে ডাকছে অবিরত তাঁর কি ঘরে থাকার কোন উপায় আছে ! পথই তাঁর সাথী, পথই তাঁর সম্বল।

বারো বছর যিনি গৃহত্যাগ করে গেছেন আজ তিনি আবার দেশে ফিরে আসছেন। গ্রামে যেন অভূতপূর্ব সাড়া পড়ে গেলো। পথ ঘাট সবাই মিলে পরিষ্কার করে ফেললো। বারো বছর আগে যেরকমটি ছিল আজ না জানি কেমন সে দেখতে হয়েছে। মাথা আঁচড়ে না দিলে যার চলতো না, আজ না জানি তার মাথার চুলের কি অবস্থা হয়েছে। আত্মীয়স্বজন আনন্দে আত্মহারা হয়ে গেলেন তাঁদের নলিনীকান্ত আজ ভারতবিখ্যাত সাধক স্বামী নিগমানন্দ পরমহংস ; তিনি আজ গ্রামে আসছেন।

গ্রামের লোক তাঁকে কীর্তন করে অভ্যর্থনা জানালো। কেউ দিলো ফুলের মালা। কেউ দিলো চন্দনের টিপ। যে আসে সেই তাকে প্রণাম করে। কে ছোট কে বড় আজ আর তা ভ্রূক্ষেপ নেই। মহাসাধক এসেছেন গ্রামে।

ঠাকুর নিগমানন্দ শুনলেন তাঁর পিতা ভুবনমোহন অনেক দিন হলো দেহত্যাগ করেছেন। বারো বছর আগে যাঁরা তাঁকে শাসন করেছেন, তিনি যাঁদের সম্মান করে চলতেন, আজ তাঁরা এসে তাঁর পদতলে গড়াগড়ি যাচ্ছেন।

আজ তাঁদের সে নলিনীকান্ত নেই, হারিয়ে গেছে কোথায় তা কে জানে। তার মাঝে জন্ম নিয়েছে স্বামী নিগমানন্দ। নলিনীকান্তর সম্পর্কে যাঁরা গুরুজন হতেন আজ তাঁরাই তাঁকে গুরুর মত শ্রদ্ধা জানাচ্ছেন। প্রণাম করে পায়ের ধুলো নিচ্ছেন। ভ্রাতৃবধূ সম্বন্ধে যারা, তারাও এসে আজ তাঁর পা ছুঁয়ে প্রণাম করছে।

একটা অঘটন যেন ঘটে গেলো আজ কুতুবপুরের মাটিতে। এ মাটিতে প্রতি ধূলিকণায় যার অস্তিত্ব ছিল, সে মাটিও আজ মহাতপস্বীর পদস্পর্শ পেয়ে যেন ধন্য হলো।

নলিনীকান্ত তাঁর বাড়ির বারান্দায় বসে আছেন। দলে দলে লোক আসছে—তাদের হারিয়ে যাওয়া নলিনী আজ গ্রামে ফিরে এসেছে এক জ্ঞানতপস্বী হয়ে। এ সুযোগ কি কেউ ছাড়ে, না ছাড়তে পারে?

এমন সময় এক বৃদ্ধ লাঠি হাতে ঠুক ঠুক করতে করতে এসে বললে: কই, আমাদের সে নলে কই! একবার দেখি, সে কেমনটি হয়েছে। শুনলাম সে নাকি এক মস্ত সাধু হয়েছে।

নলিনীকান্ত বৃদ্ধের দিকে তাকিয়ে থাকেন একভাবে। বৃদ্ধ যেন চোখ ফেরাতে পারে না।

এ কি হলো বৃদ্ধের।

বেশ কিছুক্ষণ পরে বৃদ্ধ আবার বলে উঠলো: কিগো, সাধু হয়ে আজ যে আমাকে আর চিনতেই পারছো না!

নলিনীকান্ত একটু হেসে বললেন: কই, আপনি শসা এনেছেন?

বৃদ্ধ আনন্দে চিৎকার করে উঠলেন: নলে ঠিক চিনেছে! বাবা, একে বলে সাধু। আজ বারো বছরের কথা ঠিক মনে আছে। সেই যে মাচায় শুধু শসার ফুল আসতো আর ঝরে যেতো; তারপর নলেকে একটা খাওয়ানোর পর তবে তো ফল দাঁড়ালো।

নলিনীকান্ত বৃদ্ধের হাত ধরে কাছে বসিয়ে বললেন : বড্ড বুড়ো হয়ে গেছেন।

: আর বাবা, এবার যেতে পারলে হয়। এ দেহটা টেনে নিয়ে আর যে বেড়াতে পারি নে—তা তুই একটু আশীর্বাদ কর, যেন তাড়াতাড়ি নিজের ঘরে যেতে পারি।

: নিজের ঘর !

নলিনীকান্ত কেমন যেন একটু অন্যমনস্ক হয়ে গেলেন। তিনি চোখ দুটো মুদ্রিত করে বলে উঠলেন—

"মন এব মনুষ্যানাং কারণং বন্ধমোক্ষয়োঃ।
বন্ধায় বিষয়াসক্তং মুক্তৈ নির্বিষয়ং স্মৃতম ॥"

মনে বৈরাগ্য না আসলে নিজের ঘর চেনা যায় না। নিজের ঘরে যেতে গেলে আগে থেকেই সাজতে হবে। দেহ-মনের ধুলো বালি পরিষ্কার করে তবে নিজের ঘরের দিকে পা বাড়াতে হবে। নিজের ঘরের জন্য এত চিন্তা কেন।

"যাবজ্জননং তাবন্মরণং তাবজ্জননী জঠরে শয়নম্।"

তবে আর ভাবনা কি! এ মায়ার সংসার, ও তো পুতুল খেলা। কত রং-বেরঙী পুতুল। সবই অনিত্য, একদিন না একদিন ভাঙবেই। তখন কান্না, হাহাকার, মনোকষ্ট। এত কষ্ট না পেয়ে তার চেয়ে নিত্য বস্তুর দিকে মনোনিবেশ করাই ভালো।

পিতা কস্য মাতা কস্য কস্য ভ্রাতা সহোদরাঃ ?
কায়াপ্রাণে ন সম্বন্ধঃ কা কস্য পরিবেদনা !

এই তো আমাদের সংসার ! এ ছাড়া তো আর কিছু নয়। এ দেহ যত দিন আছে, তত দিন তুমি আমার দাদা, মাসীমা, স্ত্রী, পুত্র। এ দেহ চলে গেলে সব সম্বন্ধই তো শেষ।

বৃদ্ধ নলিনীকান্তর দিকে চেয়ে আছে, দু'চোখ তার জলে ভাসছে। এ কি নলিনীকান্ত না অন্য কোন মহাপুরুষ ? সমস্ত দেহ-মন যেন তোলপাড় করতে থাকে।

নলিনীকান্তর পা দুটো জড়িয়ে ধরে বলে ওঠে : তুই বাবা বলে দে নিজের ঘরের ঠিকানা। তুই তো সবই জেনেছিস।

নলিনীকান্ত বললেন : চৈতন্য পুরুষের সন্ধান নিতে হবে। আমাদের

অন্তর-সিংহাসনে দেবতা বসে আছেন কিন্তু সে চৈতন্যময়কে দেখতে পাচ্ছি না, কারণ তাঁর চারপাশে বেড়া দিয়ে রেখেছে হিংসা, পরশ্রীকাতরতা, কাম, ক্রোধ। এ বেড়া একবার ভাঙতে পারলেই সে চৈতন্যপুরুষকে দেখা যাবে। সেই দর্শন হলেই বোঝা যাবে—ছুনিয়াটা কি, এখানে কে আপন, কে পর। আমিই বা কে, কোথা থেকে আমি এলাম। দিব্যজ্ঞান তখনই তো পাওয়া যায়। তখন আর ভালো লাগবে না এই পুতুল সাজানো সংসার, তখন বোঝা যাবে স্ত্রী-প্রেম-পুত্রকন্যা, স্নেহ কত মেকী। হৃদয়ের দিকে তাকাতে হবে, সেখানে যে শ্যামসুন্দর পরম চৈতন্যময় অন্তর আলো করে বসে আছেন।

নলিনীকান্ত ক'দিন দেশে থাকেন। এ সময়ে অনেকে তাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ করে।

বারো বছর আগে যে ঘরে তিনি সুখশয্যা রচনা করেছিলেন আজ সে ঘরের কথা তাঁর সব বিস্মরণ হয়ে গেছে। ঐ তো নিমগাছের তলায় তুলসীমঞ্চ, যেখানে বসে নিত্য সন্ধ্যায় তাঁর বাবা ও মা সন্ধ্যা-আহ্নিক করতেন। ও-পাশের ঘরে স্ত্রী সুধাংশুবালা তার স্বপ্নমন্দির রচনা করেছিল। আজ সে ঘরে বাছড় আর চামচিকের আস্তানা হয়েছে। আজ সে নিজের ঘরে চলে গেছে!

পরের ঘরে বাস করে যে কি সুখ তা তো সে মর্মে মর্মেই বুঝতে পেরেছে। কার ঘর, কার সাজসজ্জা—একটা ঝড় বা একটা ভূমিকম্পেই তো এর অস্তিত্ব চিরতরে বিলুপ্ত হয়ে যেতে পারে। তবে এ পরের ঘরের ওপর মানুষের এত মায়া কেন! নিজ নিকেতনের খোঁজ যতদিন মানুষ না করবে ততদিন মানুষ জ্বলবে, পুড়বে, ছাই হবে, কাঁদবে, ভাববে, হায় হায় করবে।

নলিনীকান্ত বাইরে এসে দাঁড়ালেন। এ বৃশ্চিক জ্বালা তাঁর যেন সহ্য হয় না। তাই সবার অলক্ষ্যে রাতের অন্ধকারে তিনি গ্রাম ত্যাগ করলেন। সবাই জানে নলিনীকান্ত ঘরে ফিরে আসবার জন্য ঘর ত্যাগ করেন নি।

॥ ২০ ॥

স্বামী নিগমানন্দ আসামে এসে থেমে গেলেন। খানিকটা জমি নিয়ে একটা আশ্রম তৈরি করলেন। আশ্রমের নাম দিলেন শান্তি আশ্রম। প্রথম প্রথম আসামের মানুষ বাঙালী সাধুকে বরদাস্ত করতে পারে নি। পরে ধীরে ধীরে সবাই তাঁর প্রতি আকৃষ্ট হয় ও অনেকে তাঁকে গুরু বলে গ্রহণ করে। সাধক পুরুষদের অনেকেই আজ পর্যন্ত অনেক রকম নির্যাতন ভোগ করেছেন, কিন্তু দেখা গেছে, পরে আবার তাঁর প্রতিই আকৃষ্ট হয়েছেন।

স্বামী নিগমানন্দ ধীরে ধীরে আসামের মাটিতে তাঁর সাধনার শিকড় ছড়াতে লাগলেন। তিনি এই সময় শুধু সাধন-ভজন নিয়েই থাকেন নি; তাঁর রচিত অমূল্য গ্রন্থ 'জ্ঞানীগুরু', 'যোগীগুরু' ও 'তান্ত্রিকগুরু' এক সময় প্রকাশিত হয়।

স্বামী নিগমানন্দর নাম দেশে দেশে ছড়িয়ে পড়ে, ভারতবর্ষের প্রায় সমস্ত প্রদেশেই এই মহাপুরুষের সাধনার কথা প্রকাশ হয়ে যায়। সারস্বত মঠ, ঋষিকুল শিক্ষায়তন গড়ে ওঠে। ভারতের প্রায় সমস্ত জায়গায় মঠ প্রতিষ্ঠা হয়। ওড়িশার পুরীতে, আসামের কোকিলামুখে, বাংলার হালিশহরে, নিগমানন্দর সারস্বত মঠ স্থাপিত হয়। দক্ষিণ ভারতেই অনেক জায়গায় তাঁর প্রভাব দেখা যায়। নিগমানন্দ বেশী প্রিয় হয়ে পড়েন অসমীয়াদের কাছে। যারা বহু মহাপুরুষের বাণী কর্ণপাত করে নি, শান্তি আশ্রমের সন্ন্যাসী ও ব্রহ্মচারীদের স্তোত্রগুলি তাদের ঘুমন্ত মনকে যেন চাবুক মেরে জাগিয়ে দেয়—

"ত্বমেব মাতা চ পিতা ত্বমেব
ত্বমেব বন্ধুশ্চ সখা ত্বমেব
ত্বমেব বিদ্যা দ্রবিনং ত্বমেব
ত্বমেব সর্বং মম দেব দেব।"

এ বাণী তারা মহামন্ত্রের মত গ্রহণ করে মহাজীবনের সন্ধান পেলো।

বাংলাদেশের প্রতি বিভাগে নিগমানন্দ একটা করে আশ্রম স্থাপন করেন। ঢাকা, বগুড়া, জলপাইগুড়ি, হালিশহর, খড়কুশামা (মেদিনীপুর) প্রভৃতি স্থানেও মঠ প্রতিষ্ঠিত হয়। কুতুবপুরে গুরুধামে মন্দির, হাসপাতাল

ও উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয় গড়ে ওঠে। কিন্তু পাকিস্তান হওয়ার পর মেদিনীপুর জেলায় কাঁথির কাছে বনমালীপুর গ্রামে গুরুধাম স্থানান্তরিত হয়। ঠাকুরের ছোট ভাই রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় সেখানে সেবাইত ছিলেন। বর্তমানে তাঁর পরিবারবর্গ সেখানে আছেন ও তাঁর বড় ছেলে ঠাকুরদাস ব্রহ্মচারী সেবাইত রূপে ঠাকুর সেবা চালাচ্ছেন! বগুড়ার আশ্রমটির বর্তমান অবস্থা কি হয়েছে তা জানা যায় না। পূর্ববঙ্গ থেকে পূর্বস্থলীতে একটা আশ্রম ও মেদিনীপুর জেলায় দাঁতনের কাছে আনন্দনগরে আর একটা আশ্রম স্থানান্তরিত হয়েছে। নতুন আশ্রমও কিছু কিছু পশ্চিমবঙ্গে স্থাপিত হয়েছে—কালনা, মেদিনীপুরের ছোট বাড়ুয়া গ্রামে তৈরি হয়েছে নিগমানন্দ আশ্রম ও সেবায়তন।

কোকিলামুখ মঠের বর্তমান অবস্থা সম্বন্ধে ১৩।১।৭১ তারিখের লিখিত পশ্চিম বাংলা সারস্বত আশ্রমের বর্তমান অধ্যক্ষ স্বামী সেবানন্দ সরস্বতী মহারাজের পত্রের অংশবিশেষ নিম্নে উদ্ধৃত হলো :

"সম্মিলনীর পর আমরা কয়েকজন মঠে গিয়াছিলাম। জোড়হাটে নূতন আশ্রমে প্রথমে উঠি, তৎপরদিন আমরা মঠ দেখতে যাই। মঠের বর্তমান অবস্থা দেখতে গিয়ে কান্নায় বুক ভেসে যায়। দুরন্ত ব্রহ্মপুত্র মঠের অস্তিত্ব কিছুই রাখে নি, তার প্রাণপ্রিয় মঠ আর মঠ নাই। এই দৃশ্য মর্মান্তিক, নূতন লোক দেখে কিছুই বুঝতে পারবে না। দূর থেকে সমাধি-মন্দিরের চূড়া দেখা যায়, তারপর মঠের ভিতর দাঁড়িয়ে আছে আসল মন্দির, ভোগঘর, ভাণ্ডারঘর ও সন্ন্যাসীদের ঘর। এই সব ঘরের ওপর যে টিনগুলো দেওয়া ছিল সে সব খুলে জোড়হাটে নিয়ে আসা হয়েছে। পুকুরপাড়ে আজও দাঁড়িয়ে আছে চারটি নারিকেল গাছ, একটা বকুল ও একটা অশোক গাছ। আর কোন গাছপালার চিহ্ন নেই, সমস্ত মঠ এবং প্রাঙ্গণে ২।৩ ফুট বালি পড়েছে। সমাধি-মন্দির যদি না থাকতো তাহলে এখানে যে কিছু ছিল তা একেবারেই বোঝা যেতো না। ব্রহ্মপুত্র যদি আর না ভাঙ্গে তাহলে নূতন ভাবে সাজানো যেতে পারে। গভর্ণমেণ্ট যে বাঁধ দিয়েছে তাতে একটু আশার সঞ্চার হয়েছে।"

শ্রী ১০৮ স্বামী নিগমানন্দ পরমহংস দেব প্রতিষ্ঠিত আসাম বঙ্গীয় সারস্বত মঠের বর্তমান মোহান্ত মহারাজ স্বামী আত্মানন্দ সরস্বতী মহারাজের আর্য-দর্পণ পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞপ্তি থেকে নিম্নলিখিত বিবরণ জানা যায় :

"এতদ্বারা জনসাধারণ ও শ্রীশ্রীনিগমানন্দের শিষ্য প্রশিষ্য ও ভক্তগণকে জানানো যাইতেছে যে, কোকিলামুখস্থিত আসাম বঙ্গীয় সারস্বত মঠ ব্রহ্মপুত্র নদের করাল গ্রাসে পতিত হইয়াছে, আজ চারি বৎসর যাবৎ জোড়হাট শহরের পার্শ্বে পরমুড় ইটাখালি গ্রামে উহার অনুকূলে অস্থায়ীভাবে সামান্যকম চার বিঘা মাত্র স্থানের উপর আসাম বঙ্গীয় সারস্বত আশ্রম স্থাপন করা হইয়াছে।"

॥ ২১ ॥

মধ্যপ্রদেশের বস্তাররাজ একসময় দেহতত্ত্ববোধে জেগে ওঠেন। তাঁর মনে অধ্যাত্ম সাধনার তৃষ্ণা এসে উপস্থিত হয়। রাজ্য পরিচালনা, প্রজাপালন, তাদের সুখ-দুঃখের প্রতি দৃষ্টিদান তাঁর জীবনের সঙ্গে ওতপ্রোত ভাবে জড়িত ছিল। এই সব নিয়ে তিনি প্রজানুরঞ্জন রাজার মত সুখেই দিন কাটাতেন; তবুও তাঁর মনে হতো এর চেয়েও আরও সুখ আছে—সেই সুখের সন্ধানে তিনি চঞ্চল হয়ে পড়েন।

সাধক কবি কমলাকান্ত একসময়ে গেয়েছিলেন—

"কেহ আসিয়া সংসার মাঝে নানা সুখ করে
পাইয়ে রাজ্যভার রে—
আমার দরিদ্রের ধন ও দুটি চরণ
হৃদয়ে করেছি সার রে—"

কিন্তু রাঙাচরণের আশ্রয় পেতে হলে তো গুরু চাই; সে গুরু তিনি কোথায় পাবেন, কি করে পাবেন?

একদিন তিনি দক্ষিকেশ্বরের মন্দিরে ধর্না দেন। দিন গেলো, সন্ধ্যে গেলো, রাত্রিও তো চলে যায়। অবশেষে শেষ রাতে হঠাৎ তিনি মন্দিরের ভিতর থেকে শুনতে পান, দেবী যেন বলছেন: তোর গুরু পরমহংস স্বামী নিগমানন্দ সরস্বতী; তাঁর কাছে তোর সব কিছু লাভ হবে।

মধ্যপ্রদেশের কোন জায়গায় তাঁর নাম কেউ জানে না। আর তখন তাঁর নামও এত ছড়ায় নি। বাংলাদেশের মানুষ, একথা বস্তাররাজ শুনেছেন, কিন্তু বাংলাদেশ তো এতটুকু নয় যে তাড়াতাড়ি সন্ধান পাবেন। বাংলায় লোক পাঠিয়ে অবশেষে তিনি সন্ধান পেলেন ও নিগমানন্দের চরণে এসে আশ্রয় নিলেন।

ধন জন পরিপূর্ণ ঐশ্বর্যবান রাজার এমনি আশ্রয়ের প্রয়োজন হয়। ক্ষমতাশালী উচ্চ শিরও নত হয়।

স্বামী নিগমানন্দ বস্তাররাজের দিকে চেয়ে একটু হাসলেন। বললেন: রাজ্যসুখও ছেড়ে আসলে বাবা, এমন বোকামীও কেউ করে নাকি!

বস্তাররাজ হাতজোড় করে বলেন : ঠাকুর, আমি বড় অপরাধী, আমাকে চরণে একটু আশ্রয় দিন। রাজা হওয়ার সুখ খুব পেয়েছি, এবার মহারাজাধিরাজের কৃপা চাই ; কিভাবে পাবো তাই আমাকে বলুন।

নিগমানন্দ বলেন : ডিমের খোসা ছাড়িয়ে এই তো সবে বেরিয়ে- এলে। এখনই সব কিছু চাইলে চলবে কেন ? রাজা ছিলে, এবার ফকির হও, ফকিরের যা কাজ তাই করো, তবে তো জানতে পারবে।

বস্তাররাজ আর কিছু বলেন না, শুধু তাঁর কৃপাদৃষ্টির দিকে একদৃষ্টে চেয়ে থাকেন।

নিগমানন্দ কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বলেন : জগতে মিথ্যা যাহা সব কিছুই জাগ্রত। শুধু জাগ্রত নয়—মিথ্যা জাগরণ স্বপ্ন ও সুষুপ্তির অধীন, আর সত্য সব সময় তুরীয়। সাধনার দ্বারা অবিদ্যার নাশে স্বরূপজ্ঞান যখন এসে যায়, যখন আত্মসত্তায় প্রবুদ্ধ হওয়া যায় ; তখনই মাত্র জানা যায় যে একমাত্র ব্রহ্মচৈতন্যই বিদ্যমান—ব্রহ্মাতিরিক্ত কোন সত্তা নেই।

স্বামী নিগমানন্দ বস্তাররাজের মাথায় হাত দিয়ে বলেন : সৎ চিন্তা করো, মানুষের মাঝে সৎ চিন্তার বাসনা যাতে জাগে সেই চেষ্টা করো, এও এক সাধনা —এই সাধনাতে সিদ্ধিলাভ করো তাহলে ঈশ্বরকৃপা লাভে দেরি হবে না।

বস্তাররাজ তাঁকে প্রণাম করে উঠে দাঁড়ালেন।

ঠাকুর নিগমানন্দ বললেন : আশীর্বাদ করি, তুমি রামের মত প্রজানুরঞ্জন হও।

॥ ২২ ॥

ইন্দোর রাজ্যের সরকারী কর্মচারী শ্রীপাঠক ; 'সংসার সংসার খেলা' আর তাঁর ভালো লাগে না। ধন জন সম্পত্তি মান প্রতিপত্তি সবই তিনি অর্জন করেছেন, কিন্তু জীবনের শেষ প্রান্তে এসে তাঁর মনে হলো কিছুই তিনি পান নি —যা পেয়েছেন তা অল্পমেয়াদের; দীর্ঘমেয়াদের কোন জিনিসই তিনি পান নি। সংসারের মায়াপাশ ছেড়ে এবার তিনি একটু শান্তি চান। কিন্তু কি করে তিনি তা পাবেন ?

প্রত্যহ তিনি নদীর ধারে এসে বসে বসে ভাবেন—সাধকরা তাঁদের জীবনে অলৌকিকভাবে গুরুর সন্ধান পান, অত্যন্ত আশ্চর্যজনক ভাবে এক একজন সাধককে এসে গুরু পথনির্দেশ দিয়ে যান, কিন্তু তিনি তো সাধক নন, কোনদিন সাধন ভজন করেন নি, তবে তিনি কিভাবে সেই মহান গুরুর সন্ধান পাবেন ?

নদীর ধারে বসে বসে তিনি শুধু ভাবেন ঐ নদীর ঢেউয়ের দিকে চেয়ে, ছোট ছোট ঢেউগুলো সবেগে ছুটে চলেছে, হয়তো সাগরে নয়তো মহাসাগরে। কার যেন দেখা পেতে চায়, কাকে পেলে যেন তাদের চলা থামবে। কিন্তু তিনি তো একই জায়গায় বসে আছেন। না চললে, না ভেসে বেড়ালে তিনি কি করে সেই জ্যোতির্ময় পুরুষের দেখা পাবেন ?

হবে না, তাঁর জীবনে কোন মহাপুরুষ আসবেন মহাজীবনের নির্দেশ দান করতে।

প্রত্যহ তিনি নদীর ধারে যান আর একই কথা চিন্তা করেন। একদিন হঠাৎ তিনি ঊর্ধ্বআকাশে এক দিব্যমূর্তি দর্শন করলেন। কে এই মহাজ্ঞান তাপস ? জীবনে তিনি তাঁকে দেখেন নি—হঠাৎ মূর্তিটি আকাশের গায় মিলিয়ে গেলো। সন্ধ্যার অন্ধকারে তিনি ভাবতে ভাবতে বাড়ির পথে আসছেন। যাঁকে চিনি না, যাঁকে জানি না, যাঁকে কোনদিন দেখি নি, তিনি এভাবে দেখা দিলেন কেন ? আর দেখাই যদি দিলেন তবে কোথায় তাঁকে পাবো তা তো বললেন না !

হঠাৎ তাঁর কানে যেন বাতাসের মত কে বলে গেলো, বার বার তিনবার ঃ স্বামী নিগমানন্দ পরমহংস।

আর কি ভোলেন তিনি ! তারপর তিনি 'সাধুসন্তদের' সঙ্গে যোগাযোগ করে খোঁজ নিয়ে নিয়ে একদিন তাঁর চরণে গিয়ে আশ্রয় নিলেন।

কোকিলামুখের শক্তি আশ্রমে স্বামী নিগমানন্দ তখন আছেন। এমন সময় পাঠকজীর আবির্ভাব হলো।

চিনতে কি আর ভুল হয় ? এই তো সেই মূর্তি যা তিনি ইন্দোরের নদী-তীরে আকাশের গায়ে দেখেছিলেন।

পাঠকজীর আনন্দে আর চোখের পলক যেন পড়ে না।

স্বামী নিগমানন্দ অন্তর্যামী, তিনি তো সবই জানেন। ইশারা করে ডাকলেন পাঠকজীকে।

পাঠকজী এগিয়ে যেতেই তিনি বললেন : ভক্তি যার আছে তার কাছে ভগবানও আছে।

পাঠকজী হাতজোড় করে বললেন : কিন্তু আমি তো সাধন ভজন জানি না বাবা।

: তবুও তোকে ঐভাবে দেখা দিলাম কেন, এই তো ! সাধন ভজনই কি সবার বড় রে ! ভক্তিই হচ্ছে আসল। এই ভক্তির জোরেই তো রামকৃষ্ণ পরমহংস মহামায়ার দর্শন পেয়েছিলেন। এই ভক্তিতেই জয়দেবের ঘরে এসে স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ অন্নগ্রহণ করেছিলেন। এই ভক্তির বলেই তো সাধক রামপ্রসাদ, কমলাকান্ত, বামাক্ষেপা মায়ের কৃপা লাভ করেছিলেন। ভক্তিই তো সব। পরমেশ্বরে পরম অনুরক্তিকে ভক্তি বলে। ভগবানে পরম প্রেমই তো ভক্তি। বাসনা কামনা ভুলে, বিষয় বৈভব ভুলে, স্ত্রী পুত্র এমন কি নিজেকে ভুলে গিয়ে ভগবানে যে আন্তরিক অনুরক্তি, তাকেই তো ভক্তি বলে। যে বলতে পারে— তুমিই আমার সব, তুমি ছাড়া আমি কিছু জানি না, তুমিই আমার জপ তপ, তুমি আমার ধ্যান ধারণা, তুমিই আমার ধর্ম কর্ম, তোমাকে পেলে আর কিছুই চাই না— এ কথা যে বলতে পারে সেই তো ভগবানের পরম ভক্ত।

ভগবান ভক্তের কাছে বাঁধা। ভক্তি দিয়ে যে ভগবানকে বাঁধতে পারে, ভগবানও তাকে কখনও ত্যাগ করেন না। ভক্তির রজ্জুতে যত বাঁধবে, যত জোরে গিঁট বাঁধবে, ভগবানও তত বেশী বাঁধা পড়বেন। ভক্তেরই ভগবান, ভগবানের ভক্ত নয়।

ভক্তির জোরে পিতলের প্রতিমাও ভোগ গ্রহণ করেন, শালগ্রাম শিলা হাত বের করেন অলংকার পরবার জন্য, জগজ্জননী মহামায়ার পাষাণ মূর্তিরও নাকে ছিদ্র হয় সোনার নথ পরবার আশায়। ভক্তিতে কি না হয়—

॥ ২৩ ॥

ত্রিপুরার এক ক্ষুদ্র গ্রামে অশ্বিনী নামে এক যুবক স্বামী নিগমানন্দের শিষ্য, বাস করতো। সংসারে তার মা, স্ত্রী ও ছোট একটা ছেলে ছিল। ঘরের এক কোণে নিগমানন্দের একটা ছবি ছিল—নিত্য সকাল সন্ধ্যায় সকলে সেই ছবির সামনে দাঁড়িয়ে প্রণাম জানাতো। সন্ধ্যায় দেব-দেবতার পূজা অর্চনার মত সেই ছবিকে অশ্বিনী পূজো করতো।

গুরুদেবের আশীর্বাদে অশ্বিনী কোনমতে সংসার প্রতিপালন করতো। 'যা করেন গুরু' এই মনোভাব নিয়েই সংসারের হাল ধরে সংসার-তরণী বেয়ে চলেছিল। কিন্তু এ সংসারে বজ্রপাত হলো ; অশ্বিনী ক'দিনের অসুখে সমস্ত সংসারটাকে ডুবিয়ে দিয়ে দেহত্যাগ করলো।

অশ্বিনীর বৃদ্ধা মাতা স্বামী নিগমানন্দের ছবির দিকে চেয়ে চিৎকার করে কেঁদে উঠলেন : ঠাকুর তো ঘরেই বসে আছেন, তিনি কি দয়া করে তার ছেলেটার প্রাণভিক্ষা দিতে পারতেন না, এ ঠাকুরে আমার কি প্রয়োজন ? যে ঠাকুর বিপদের দিনে এগিয়ে আসেন না। সে ঠাকুর আমি নদীতে ভাসিয়ে দেবো।

প্রতিবেশীরা বৃদ্ধাকে কিছুতেই নিরস্ত করতে পারেন না। কত রকম ভয় দেখান, কিন্তু বৃদ্ধা কোন কিছুই কর্ণপাত করেন না। বৃদ্ধা ছবিটিকে হাতে করে নদীতে যাবেন এমন সময় স্বামী নিগমানন্দের আবির্ভাব ঘটলো।

তিনি এগিয়ে এসে বললেন : মা, এই তো আমি এসেছি। অশ্বিনী গেছে কিন্তু আমি তো আছি—আমিও তো তোমার সন্তান। তোমার ভাবনা কি ! অশ্বিনীর জন্য দুঃখ করো না, সে বড় শান্তিতে আছে—অযথা দুঃখ করে তাকে কষ্ট দিও না মা।

গুরু আশ্রিত যারা তাদের জন্য এমনি ভাবে সদগুরু বিপদে আপদে শান্তির বাণী শোনান, তাদের দুঃখকে নিজের ঘাড়ে নেন।

গীতায় শ্রীভগবান বলেছেন—

"যে তু সর্ব্বানি কর্ম্মানি ময়ি সংন্যস্য মৎপরা।
অনন্যেনৈব যোগেন মাং ধ্যায়ন্ত উপাসতে।

তেষামহং সমুদ্ধর্ত্তা মৃত্যু সংসার সাগরাৎ।

ভবামি ন চিরাৎ পার্থ মষ্যাবেশিত চেতসাম॥"

যারা সব কিছু ভুলে আমাতেই আত্মসমর্পণ করে আমি তাদের এই মরণশীল সংসার থেকে রক্ষা করি।

যার ভক্তি নেই তার তপ জপ সাধনা সবই ভুল। ভক্তিই মূল। এই ভক্তির মূল যার দেহজমিতে শিকড় ছড়িয়েছে, সেই ভগবানের দাস। ভক্তিতেই মুক্তি, ভক্তিতেই মোক্ষ, ভক্তিতেই সিদ্ধিলাভ, ভক্তিতেই ভগবানে আশ্রয়।

ভক্তির স্বরূপ কি?

"অদ্বেষ্টা সর্ব্বভূতানাং মৈত্র করুণ এব চ।

নির্ম্মমো নিরহঙ্কার সম দুঃখ সুখঃ ক্ষমী॥"

অশ্বিনীর মৃত্যুর পর তার স্ত্রী শৈলবালা বড়ই মুষড়ে পড়েন। স্বামী নেই, সংসারের এই অবস্থা। কি করে তারা নিজেরাই বা বাঁচবে। কি করেই বা কোলের ছেলেটা বাঁচবে। এই চিন্তাতেই শৈলবালা দিন দিন ক্ষীণ হয়ে গেলো।

বৃদ্ধা শাশুড়ী চোখের জলে বুক ভাসান। স্বামী নিগমানন্দ ঠিক সেই মুহূর্তেই তাদের সামনে এসে দাঁড়ান।

বৃদ্ধার চোখের জল দু'হাতে মুছিয়ে দিয়ে বলেন: অশ্বিনীর বৌকে বলো, তার স্বামীর জন্য চোখের জল না ফেলে জগৎস্বামীর জন্য কাঁদতে। তাঁর ঘরণী হতে পারলে আর দুঃখ নেই। কাঁদতে হয় তাঁরই জন্য যেন কাঁদে। অশ্বিনী তো মরণশীল স্বামী। কিন্তু যাঁর মৃত্যু নেই, যাঁর জন্ম নেই, সেই জগৎস্বামীর চরণে আশ্রয় নিতে বলো, কোন অভাব তিনি রাখবেন না।

স্বামী নিগমানন্দ বলেন: কখন যে কার ওপর ভগবানের কৃপা হয় তা কেউ বলতে পারে না। তোমার অন্নাভাব, দুবেলা কি মুখে দেবে তার সংস্থান নেই। ছেলে কাঁদছে ক্ষুধার জ্বালায় আর তুমি ফন্দী ফিকির খুঁজছো কি করে এ সমস্যার সমাধান করা যায়; কিন্তু কই, একবারও কি ভাবছো বিশ্বের অফুরন্ত ভাণ্ডারের যিনি মালিক তাঁর কথা? তাঁকে কি তুমি জানাচ্ছ তোমার এ দুঃখের কথা! জানাচ্ছ না। তিনি তো ভাণ্ডার খুলেই বসে আছেন—তাঁকে ডাকো, তাঁকে জানাও, নিশ্চয়ই তিনি তোমার আবেদন মঞ্জুর করবেন। তিনি যে কাঙালের বন্ধু—তিনি যে বড় দয়াল। ভক্তিভরে তাঁকে ডাকো তিনি নিশ্চয়ই তোমার দুঃখ মোচন করবেন।

তারপর হঠাৎ অন্তর্ধান করলেন।

॥ ২৪ ॥

স্বামী নিগমানন্দ কোন্ মতবাদে বিশ্বাসী ছিলেন ? তিনি শাক্ত না বৈষ্ণব না অদ্বৈতবাদী ! কোন মতই তিনি ছোট মনে করেন নি। তিনি প্রত্যেক মতকেই শ্রদ্ধার সঙ্গে দেখেছেন। সাধনার প্রথম ভাগেই তিনি আদ্যাশক্তি মহামায়ার দর্শন পেয়েছেন। আবার বৃন্দাবনে গিয়ে কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলে কেঁদেছেন আবার কাশীতে অন্নপূর্ণার দর্শন পেয়েও তাঁকে মেনে নেন নি।

ভগবানের কাছে পৌঁছাতে হবে, তা পায়ে হেঁটে হোক, নৌকায় করে হোক, একভাবে পৌঁছাতে হবে। যেন তেন প্রকারেণ ঈশ্বরদর্শন ! এর ভিতরে আবার মত কি ! আমরা সকলেই তো তার সেই একই সৃষ্টিকর্তার সৃষ্ট। আমরা তবে মত নিয়ে এ বিরোধ করি কেন ! স্বামী নিগমানন্দ এ সব পছন্দ করতেন না। রামকৃষ্ণ পরমহংস শক্তির আরাধনা করেছেন, কৃষ্ণেরও সেবা করেছেন। মসজিদেও গেছেন, গির্জাতেও গেছেন। দেখেছেন সব জায়গাতেই সেই একই শক্তির খেলা।

স্বামী নিগমানন্দ বলেন : জীব যতদিন মায়ার পাশে আবদ্ধ থাকে তখন সে বদ্ধজীব। সাধুসঙ্গ দ্বারা যে কৃপা লাভ করেন ও সাধনা করেন তখন সে শাক্ত। আর মায়ামুক্ত হয়ে যখন আত্মপ্রেমিক হন, প্রেমরসমাধুর্য সব সময়ে আস্বাদন করেন, তখন সে বৈষ্ণব।

রামপ্রসাদ রামকৃষ্ণ এঁরা শক্তিসাধক হয়েও পরম বৈষ্ণব ছিলেন। শাক্ত না হলে তার বৈষ্ণব হবার কোন অধিকার জন্মে না।

রামপ্রসাদ যত গান গেয়েছেন সব শুনলে তাঁকে শাক্তই মনে হয়। কিন্তু যখন গেয়ে ওঠেন—

"ষড়দর্শনে দর্শন মিলে না আগম নিগম তন্ত্রসারে।
ভক্তিরসের রসিক সে যে সদানন্দে বিরাজ করে॥"

এ গান শোনার পর মনে হয় তিনি পরম বৈষ্ণব।

আদ্যাশক্তি মহামায়া তিনি স্বয়ং শক্তির আধার হয়েও পরম বৈষ্ণবী।

চণ্ডীদাস যে সাধনা করে গেছেন তা সহজ মানুষের সাধনা—মানুষ শুধু মানুষ নয়, মানুষ দেবতা ; তার ওপরে আর কি আছে। তাই মানুষ শ্রীকৃষ্ণ

দেবতা হয়ে মানুষভাবেই মানুষকে শিক্ষা দিয়ে গেছেন—মানুষকে আপন করে তার সাথে লীলা করেছেন—যে লোকশিক্ষা, মনুষ্যাচার তিনি শিক্ষা দিয়েছেন তা যুগ যুগ ধরে মানুষ হৃদয়ে ধারণ করবে।

নিত্য বৃন্দাবন মানুষের উপনিবেশ।

মানুষরূপী দেবতার পদরজে ধন্য যে বসতি সে বসতি বৃন্দাবন ছাড়া আর কি!

চণ্ডীদাস সেই মানুষের সাধনা করেছেন। সেই সাধনা করেই তিনি সিদ্ধলাভ করেছেন। মানুষকে যিনি দেবতারও ওপরে আসনে দেন, সে মানুষ যে সহজ নয় মোটেই তা বোঝা যায়।

চণ্ডীদাস এক জায়গায় বলেছেন:

> "গোলোক উপরে মানুষ বসতি তাহার উপরে নাই।
> মানুষ ভাবেতে বসতি করিলে তবে সে মানুষ পাই॥"

সার কথা, যাঁকেই ডাক না কেন, মন প্রাণ এক করে তাঁকে ডাকতে হবে। হও না তুমি শাক্ত, হও না তুমি বৈষ্ণব, কিছু তাতে যায় আসে না। সাধন ভজন দ্বারা যে যার ইষ্টের সন্ধান পাবে, সে শুধু নিজেই মুক্তি পাবে না। জগতের সকল জীবের মুক্তিই হবে তার পরবর্তী সাধনা।

আমরা সংসারবদ্ধ জীব, সংসারের কঠিন বাঁধনে আমাদের হাত পা বাঁধা। তবুও আমাদের মাঝে মাঝে বাঁধন আলগা করতে দোষ কি? যে যে ভাবে পারি তাঁকে ডাকি, যেটুকু পারবো তাতেই কাজ হবে।

গীতায় শ্রীভগবান বলেছেন:

> "তেষাং সততযুক্তানাং ভজতাং প্রীতিপূর্ব্বকম্।
> দদামি বুদ্ধিযোগং তং যেন মামুপযান্তিতে॥"

॥ ২৫ ॥

পরম সাধক নিগমানন্দ পরমহংসর শরীর মাঝে মাঝে অসুস্থ হতে থাকে। ঘুরে বেড়ানোর সামর্থ্যও যেন দিন দিন তিনি হারাতে থাকেন। শিষ্যদের কাছে মাঝে মাঝে তিনি বলেন: ওরে, আর আমার দেরি নেই। আমার কাজ শেষ হয়ে আসছে।

কিন্তু তাঁকে তো আর একবার দেশে যেতে হবে।

বারো বছর আগে একবার গিয়েছিলেন, আবার তো বারো বছর কেটে গেলো। তাঁর যাওয়ায় দিনও সব ঠিক হয়ে গেলো।

গ্রামের লোক তাঁর এ সংকল্প শোনবার পরই কুতুবপুরে একটা স্মৃতিমন্দির ও মেহেরপুর থেকে প্রায় আট মাইল কাঁচা রাস্তা কুতুবপুর পর্যন্ত পাকা করে ফেললেন।

১৩৩৪ সালে কুতুবপুরে স্বামী নিগমানন্দ সারস্বত মন্দির নামে উচ্চ বিদ্যালয় স্থাপিত হয়েছিল। মাসটা জানুয়ারী! গাড়াবেড়ে গ্রামের ডাঃ সুকুমার সরকার অল্প সময়ের মধ্যে স্কুলের স্টাফ ঠিক করে ফেলেছিলেন। হেডমাস্টার নিযুক্ত হলেন এম. এস-সি. পাস অবিনাশ সেন।

১৩৩৩ সালের কার্তিক মাসে স্বামী নিগমানন্দ এসে পৌছালেন ভৈরবের তীরে, সারা কুতুবপুর গ্রাম সেদিন যেন এক বৃহৎ জনপদে পরিণত হলো—কত দেশ থেকে মানুষ এলো এই মহাপুরুষকে দর্শন করবার আশায়। কুতুবপুরের মাটি আজ ধন্য, সে জন্ম দিয়েছে এক দেশবিখ্যাত মহাজ্ঞান তপস্বীর।

নিগমানন্দ সারস্বত মন্দির সাজানো হলো আম্র দেবদারুর পাতায়। সারা গ্রাম আজ তীর্থক্ষেত্র।

ভৈরবের তীরে লোক ধরে না। নৌকা থেকে নামলেন স্বামী নিগমানন্দ। পূর্বাশ্রমের খুড়ামহাশয় যুধিষ্ঠির ভট্টাচার্য তাঁকে জড়িয়ে ধরলেন। নিগমানন্দের চোখে জলের ধারা—সে জলের ধারা কে রোধ করবে। কেন এ চোখের জল! তবে কি এই তাঁর শেষ পদার্পণ কুতুবপুরে?

কুতুবপুরের গ্রামবাসী সেদিন তাঁকে অভিনন্দন জানায় সংগীতের মাধ্যমে।

সেদিনের সে সংগীত আজও যেন সবার কানে বাজছে। সারা আশ্রম প্রাঙ্গণ লোকে লোকারণ্য—

সংগীত দ্বারা অভিনন্দন দেবার পর স্বামী নিগমানন্দ ধীরে ধীরে বললেন :

"তমেব শরণং গচ্ছ সর্ব্বভাবেন ভারত
তৎপ্রসাদাৎ পরাং শান্তিং স্থানং প্রাপ্স্যসি শাশ্বতম্"

তোমরা সৎ হও, সজ্জন হও, সদ্বৃত্তি তোমাদের কাম্য হোক। যার যে সাধনা, সেই সাধনার দ্বারা তোমরা এক একজন সাধক হও। ভারতবর্ষ সাধকের দেশ—সাধকশূন্য কখনও ভারত হয় নি। তোমরা শূন্য স্থান পূর্ণ করো।

দিন দিন ঠাকুরের দেহ ভেঙে পড়লো।

নিদারুণ ম্যালেরিয়া তাঁর শরীরকে যেন প্রায় শেষ করে ফেললো। দেহে যেন কোন বল নেই—

যে মানুষ সারাজীবন ধরে সারা ভারতবর্ষ ঘুরে বেড়িয়েছেন আজ তাঁর যেন চলবার শক্তি নেই।

ঠাকুর নিগমানন্দের এই অবস্থা দেখে মঠের সবাই উদ্বিগ্ন হয়ে পড়লো।

বড় বড় ডাক্তার আসেন আর দেখে যান। ওষুধ, পথ্যের ব্যবস্থা করেন। ঠাকুর হাসেন আর বলেন : ডাক্তারে আর দরকার নেই। এ দুনিয়ার সব চেয়ে বড় ডাক্তার যিনি, যাঁর কাছে আছে সব রোগের ওষুধ তিনিও তো আমাকে দেখছেন কিন্তু তাঁর ইচ্ছে নয় যে আমি আর এ দেহ ধারণ করি। আর তোমরা আমাকে ধরে রাখার চেষ্টা করো না, আমার ডাক এসেছে।

একজন ভক্ত অনুনয় করে বললেন : ডাক্তার বার বার বলে গেছেন আপনি যেন কোন কথা না বলেন।

ঠাকুর আবার হেসে বলেন : ছেড়ে দাও ডাক্তারের কথা। পরে একটু বিষণ্ন বদনে বললেন : আর আমার দ্বারা তোমাদের কোন উপকার হবে না —এ দেহ এখন চলে যাওয়াই ভালো। আমার সময় হয়ে আসছে।

সবাই 'ঠাকুর' 'ঠাকুর' বলে চিৎকার করে ওঠেন।

: আর ডেকো না—আমার নিজের ঘরে আমাকে যেতে দাও, ঠাকুর সোজা হয়ে বসলেন।

সেদিনটা ছিল ১৩৪২ সালের ১৩ই অগ্রহায়ণ শুক্রবার। শুক্লাতিথি।

বেলা ১টা বেজে ১৫ মিনিটে ঠাকুর আর চোখ মেললেন না। ভারতবর্ষের সাধনা-ক্ষেত্র থেকে একজন মহান সাধক জীবনের লীলাখেলা শেষ করে উর্ধ্বলোকে যাত্রা করলেন। বাংলা ও বাঙ্গালীর অন্তরালোক উদ্ভাসিত করে যিনি ছিলেন তিনি আর নেই!

ভারতবর্ষ বহু সাধকের সাধনভূমি। তাই ভারতবর্ষ আজ দেবভূমি—এই দেবভূমে সাধকের অভাব কোনদিন হবে না। ভারতবর্ষের মানুষও কোনদিন এ দেশকে সাধকশূন্য হতে দেবে না, ভারতবাসীর সাধনা জ্ঞানের সাধনা, ভক্তির সাধনা, ভাবের সাধনা, প্রেমের সাধনা।

এই সাধনার বলে দেব-দেবতাও বন্দী হয়ে আছেন। তাই একের পর এক মহাসাধকের আবির্ভাব ঘটবেই। যুগ যুগ ধরে তাঁদের সাধনার বলেই সারা ভারতবাসী সিদ্ধিলাভ করবে।

নিগম স্তুতিঃ

জয় সদ্‌গুরু চিন্ময় মায়াধীশ,
করুণা বিমণ্ডিত কৃপাশীস।
জয় জীবশিব বিধায়ক তনুধারী,
দুষ্কৃত দুর্জন তাপহারী।
জয় জ্ঞানীগুণীবন্দিত নমো নমঃ
হে নিগম॥

জয় মনসিজ লাঞ্ছিত কান্তিধর,
স্মিতহাসি রঞ্জিত বিম্বাধর।
জয় সদ্য বিকশিত পদ্ম আঁখি
ভবরোগে অক্ষয় জীবন রাখি।
জয় স্মরহর প্রেমঘন নমো নমঃ
হে নিগম॥

জয় বরাভয় শান্তিদ মুক্তিদাতা,
মায়ামোহ নিবারণ ত্রিতাপ ত্রাতা
জয় শরণাগত রক্ষক শক্তিময়,
জ্যোতিরাত্মা ভগবান্‌ সত্যময়।
জয় সাধুজন আশ্রয় নমো নমঃ
হে নিগম॥

জয় গদ্‌গদ সুভাষণ অমিয় বাণী
যেন মধুমঞ্জুল প্রণবধ্বনি।
জয় প্রেমীগুরু জ্ঞানীরাজ যোগীশ্বর,
মুমুক্ষু প্রার্থিত তন্ত্রধর।
জয় দেবনর বাঞ্ছিত নমো নমঃ
হে নিগম॥

জয় শিষ্যের প্রাণনিধি কল্পতরু,
কৃপাগুণে শ্যামায়িত হৃদয় মরু।

জয়　　ভাগ্য নিয়ন্তা ইচ্ছাময়,
নাশক শিষ্যের সর্বভয়।
জয়　　সদ্‌গুরু মদ্‌গুরু নমো নমঃ
হে নিগম ॥

শ্রীশ্রীনিগমানন্দ স্তোত্রম্

নিগমানন্দং　　বন্দে জগত তারকং।
নিগমানন্দং　　জ্ঞানলোক প্রকাশং॥　১
নিগমানন্দং　　ভববন্ধন মোচকং
নিগমানন্দং　　পরমানন্দ দায়কং
নিগমানন্দং　　সৌম্যমধুর দর্শনং
নিগমানন্দং　　সচ্চিদানন্দ বিগ্রহং॥　২
নিগমানন্দং　　ব্রহ্মজ্ঞান বিকাশকং
নিগমানন্দং　　ভক্তহৃদয় রঞ্জকং।
নিগমানন্দং　　সার সম্বন্দ জ্ঞাপকং।
নিগমানন্দং　　দীন পতিত পাবকং॥　৩
নিগমানন্দং　　নিগম তত্ত্বভূষণং
নিগমানন্দং　　শ্রুতি বেদান্ত ভাস্বরং।
নিগমানন্দং　　সত্যং শিবসুন্দরং
নিগমানন্দং　　অন্ধ তামস নাশকং॥
নিগমানন্দং　　জীব দুঃখ কাতরং
নিগমানন্দং　　প্রেম করুণা নিলয়ং
নিগমানন্দং　　বন্দে শ্রীপদযুগলম্
নিগমানন্দ　　চরণে গচ্ছ শরণম্॥

সমাপ্ত